হয় না। এই দিবস তৃতীয় প্রহরে পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় শোভাযাত্রা বাহির হয়। এই দিবস দুই তিন ব্যক্তি মিলিয়া যে বৃহৎ গীতাদি হয়, তাহাকে বোলাই বা বোলবাহি বলে, ইহার সুরও স্বতন্ত্র। এই রাত্রিতেও গীতাদি হয়, কিন্তু কোন প্রকার মুখাদির নৃত্য হয় না। গীত ও বাদ্যাদি সহ উৎসব হইয়া থাকে। গম্ভীরা গীতের সুরের নূতনত্ব আছে। যে বিষয় লইয়া গান আরম্ভ বা রচিত হয়, তাঁহাকে উক্ত গীতের 'মুন্দা' বলে। প্রত্যেক গানের 'মুন্দা' থাকা চাই, যাহার মুন্দা ভাল তাহার গীতও ভাল। এ বৎসর ভূমিকম্প হইল, এই ভূমিকম্প অবলম্বনে একটী গীত রচিত হইল। অতএব এই গানের 'মুন্দা' ভূমিকম্প। কোন খলিফা অর্থাৎ গানাদি রচকের নিকট 'মুন্দা' বলিয়া দিলে তবে খলিফা গীতরচনা করিয়া দেন। যে গীতের মুন্দা স্ত্রীপুরুষের বিবাদ বা অন্য কোন প্রকার ব্যবহার লইয়া, তাহার গীত রচিত হইলে স্ত্রীপুরুষাদি বেশে সজ্জিত হইয়া আপন আপন অংশ গীতাকারে অভিনয় করে। আহারার দিবস শিবের চাষের অভিনয় হয়। কেহ ধান ছিটাইয়া দেয়, কেহ হল চালায়, কেহ ধান্য রোপণ করে, কেহ কেহ গোমেষাদি হইয়া ধান্য ভক্ষণ করে, তৎপরে ধান্য কর্ত্তন করা হয়, তৎপরে মণ্ডল বা প্রধান ভক্ত জিজ্ঞাসা করেন 'কত ধান'। তাহার একটা উত্তর দিলে বৎসরের ধান্যফল স্থির হয়।

"সামশোল ছাড়া"

একটি পাত্রে একটি ক্ষুদ্র সকুল মৎস্য জীবিত রাখা হয়, তাহা লইয়া নিকটবর্ত্তী কোন জলাশয়ে ত্যাগ করিতে হয়, উহাকে সামশোল ছাড়া বলে। তৎপরে গম্ভীরার সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র গর্ত্ত করিয়া তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি বংশদণ্ড প্রোথিত করিয়া তাহার উপর একটি বংশদণ্ড বন্ধন করা হয়, তাহার পর 'ফুলভাঙ্গার' বৃক্ষশাখা সমুদয়ে আনয়ন করিয়া গর্ত্তোপরি রক্ষিত হয় এবং তাহাতে অগ্নি প্রয়োগ করিয়া ধূনা নিক্ষেপ করিলে পর ভক্তগণ একে একে উক্ত বংশে আপনার পাদদ্বয় বন্ধন করিয়া নিম্নমস্তকে দুলিতে থাকে এবং নিম্নস্থিত অগ্নিতে ধুনাচূর্ণ প্রক্ষেপ করিয়া সপ্তবার দোল খাইবার পর তাহাকে অবতরণ করাইয়া অন্য ভক্তকে ঐ প্রকার করা হয়। ইহাকে কোথাও কোথাও অগ্নিঝাঁপ বা পাটভাঙ্গা বলিয়া থাকে। শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে ঐ প্রকার অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয়। যথা—

"ঊর্দ্ধে বান্দি পদযুগ ভূমে লুটে মুণ্ড।
যেখানে উজ্জ্বল হ'য়ে জ্বলে যজ্ঞকুণ্ড॥" ৪৮
"ফেলায়ে প্রচুর তায় দেন ধুনাচূর্ণ।" ৪৯

এই প্রকারে গম্ভীরাপূজা শেষ হয়, পূর্ব্বে চৈত্রসংক্রান্তির দিবস চড়ক হইত, এক্ষণে আর হয় না।

গম্ভীরার গান।

বন্দনা, ঠুংরিগান, চারিয়াড়ি, বোলাই ইত্যাদি বিবিধ প্রকার গম্ভীরার গান প্রচলিত আছে। বন্দনা গীতাকারে রচিত; গায়ক ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডাদি হস্তপদমস্তকাদি স্থানে বন্ধন করিয়া

চুণের কৌটা নাকেগালে দিয়া বন্দনা গাইতে আরম্ভ করে এবং কোন কোন গায়ক অন্যান্য গীতাদির পূর্ব্বে শিবের বন্দনা গাইয়া থাকে। এই গানগুলি আধুনিক এবং অশ্লীলতা দোষদুষ্ট বলিয়া প্রকাশ করা হইল না।*

---

* উক্ত প্রবন্ধের সম্পর্কে মালদহ জাতীয় শিক্ষা-সমিতির সম্পাদক মহাশয়ের পত্র খানি আমার অনুরুদ্ধ হইয়া নিয়ে প্রকাশ করিলাম। সাঃ পঃ পঃ সম্পাদক।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মান্যবরেষু—

বিগত ১৩১৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে মালদহ জেলার অধিবাসিবৃন্দের সমবেত চেষ্টায় মালদহ নগরে একটি জাতীয় শিক্ষা-সমিতি স্থাপিত হয়। উদ্দেশ্য ও কার্য্য তালিকার মধ্যে জাতীয় শিক্ষাবিস্তারের নিমিত্ত বিদ্যালয়াদি স্থাপন ব্যতিরেকে নিম্নলিখিত দুইটি উদ্দেশ্য ও সন্নিবিষ্ট হয়:—

১। আমাদের দেশের ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদির উদ্ধার ও উন্নতির জন্য বিশেষ বিশেষ ছাত্র নিযুক্ত করিয়া অর্থ দ্বারা স্বাধীন চিন্তা ও মৌলিকতায় উৎসাহ প্রদান করা এবং—

২। জেলার বিশেষ ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ জন্মাইয়া তাহার গৌরব ও শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টা যথা— গম্ভীরার গান, বিষহরির গান, পদ ও কবিতা প্রভৃতির স্থানীয় সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করা। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সমিতির আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নয় যে বিদ্যালয় সংক্রান্ত মাসিক সমস্ত ব্যয় বহনের পর জেলার বিশেষ সাহিত্যের পুষ্টি সাধন উদ্দেশ্যে নিয়মিতরূপে অর্থ ব্যয় করিতে পারেন। ১৩১৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে মালদহবাসী শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া "মালদহ-সমাচার" পত্রে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন "মালদহের গম্ভীরার ইতিহাস, তাহার বিবরণ এবং বোলবাই ও অপর বিধ গম্ভীরার গান সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধের জন্য ২৫, পঁচিশ টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে। প্রবন্ধের উপযুক্ত পরীক্ষক নিযুক্ত হইবেন। সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধই পুরস্কার যোগ্য বিবেচিত হইবে। আগামী সন ১৩১৫ সালের ৩০ শে কার্ত্তিকের মধ্যে প্রবন্ধ আমার নিকট পাঠাইতে হইবে।"

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

পুনরায় ১৩১৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়—

"মালদহবাসী যদি কোন ব্যক্তি গম্ভীরার গান সঙ্কলন এবং গম্ভীরা সম্বন্ধে অন্যান্য আবশ্যকীয় বিষয় সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে ২৫, পঁচিশ টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে। একথা গত অগ্রহায়ণ মাসের "মালদহ সমাচারে" প্রকাশ করিয়াছিলাম; এতৎ সম্বন্ধে পুনরায় প্রকাশ করিতেছি যে এই কার্য্য সাধন করিবার জন্য সেই ব্যক্তিকে গম্ভীরার কেন্দ্রস্থানে ভ্রমণ, গম্ভীরার বিবরণ সম্বন্ধে পুরাতন খাতা সংগ্রহ প্রভৃতি কাজ করিতে হইলে যত অর্থ ব্যয় হইবে তাহাও বহন করা যাইবে, এজন্য যদি কিছু মাসিক বৃত্তি দরকার হয়, তাহাও

উচিত মত দেওয়া যাইবে। মালদহ জাতীয় শিক্ষা-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষের নিকট এ সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য জানিতে পারিবেন, উক্ত সমিতি উপযুক্ত বৃত্তি নির্দ্ধারণ, প্রবন্ধ পরীক্ষা এবং পুরস্কার বিতরণের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।"

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

উপরি উক্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশকালে মালদহ-শিক্ষা-সমিতির নিকট পরীক্ষার্থ মালদহের গম্ভীরার ইতিহাস ও বিবরণ-সম্বলিত একটী প্রবন্ধ উপস্থিত হয়। প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত। সমিতির একান্ত ইচ্ছা যে প্রবন্ধটী পুরস্কারযোগ্য কি না পরীক্ষার্থ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নিকট প্রেরিত হউক। কারণ সমিতি এই যে বিশেষ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেরই কার্য্য। আশা করি, পরিষদ্ এই পরীক্ষা কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আমাদিগকে মালদহের প্রাচীন ও লোকসাহিত্যের উদ্ধারের চেষ্টায় উৎসাহিত করিবেন। অবশেষে নিবেদন এই যে প্রেরিত প্রবন্ধটী অথবা ইহার অংশবিশেষ প্রকাশযোগ্য বিবেচিত হইলে তাহা প্রকাশের ভারও আমরা সাহিত্য পরিষদের হস্তে সমর্পণ করিতে চাহি।

মালদহ জাতীয় শিক্ষা-সমিতি
১৩১৩।২২শে চৈত্র

শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ
সম্পাদক।

প্রাকৃত ব্যাকরণ ও অভিধান

মহাত্মা বররুচি প্রভৃতি প্রাকৃতব্যাকরণ প্রণয়ন করিতে যাইয়া সংস্কৃত এবং প্রাকৃতের কতকগুলি পার্থক্যমাত্র দেখাইয়াছেন। তাঁহারা প্রাকৃত ব্যাকরণ লিখিতে বসিলেন, কিন্তু প্রাকৃতের আবার ব্যাকরণ কি? প্রাকৃত অর্থ কথিত ভাষা, তাহার আবার ব্যাকরণ কি? লিখিত বা সাহিত্যের ভাষা স্থির-ভাবাপন্ন, তাহারই ব্যাকরণ হয়, আর কথিত ভাষা যতদূর পারে সেই লিখিত ভাষার নিয়মেই আবদ্ধ থাকে, কখন বা তাহা হইতে ছুটিয়া যায়। ইহারা দুই ভিন্ন ভাষা নয়, ইহাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র ব্যাকরণ হইবে কেন? কাজেই বররুচি প্রভৃতি যে প্রাকৃতব্যাকরণ লিখিলেন তাহা ব্যাকরণ নয়, তাহা কেবল সংস্কৃত এবং প্রাকৃতের পার্থক্যপ্রদর্শন মাত্র। তাহাতে সন্ধি নাই, সমাস নাই, কারক নাই, ষত্বণত্ববিধি নাই। সংস্কৃতব্যাকরণ না পড়িয়া কেবল প্রাকৃতব্যাকরণ পড়িয়া প্রাকৃত লিখিতে কিম্বা বুঝিতে পারা যায় না। প্রাকৃতব্যাকরণ কেবল লিখিত এবং কথিত ভাষার পার্থক্যপ্রদর্শক।

তাহার পর কতশত যুগযুগান্তর পরে যখন য়ুরোপীয় ধর্ম্মযাজকগণ বর্ত্তমান প্রাকৃত, অর্থাৎ "বাঙ্গলা", "হিন্দি" প্রভৃতিকে সংস্কৃত হইতে স্বতন্ত্র ভাষা মনে করিয়া, বাঙ্গালীদিগকে "বাঙ্গলার" ব্যাকরণ করিতে অনুরোধ করেন, তখন বাঙ্গালীদের একটা মোহ জন্মিল। তাঁহারা এতকাল জানিতেন সংস্কৃতই তাঁহাদের বিদ্যা, সংস্কৃতব্যাকরণই তাঁহাদের ব্যাকরণ, বাঙ্গলা তাহার প্রাকৃত বা কথিত আকারমাত্র। বাঙ্গলাকে তখন পর্য্যন্ত সকলেই পরাকৃত অর্থাৎ প্রাকৃত বলিতেন। এখন এই মোহ জন্মিল যে তবেত বাঙ্গলা একটা স্বতন্ত্র ভাষা, তাহার ব্যাকরণ চাই বই কি? ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে মিষ্টার হাল্‌হেড্‌ প্রথম একখান বাঙ্গলাব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, বাঙ্গালীরা তাহা পড়িতে লাগিল। তখন হইতে বাঙ্গলা এক স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইল। তাহার নাম হইল বঙ্গভাষা, আর উহার প্রাকৃত বা পরাকৃত নাম রহিল না। তখন বাঙ্গালীরা ভাবিতে লাগিলেন এতকাল আমাদের একটা ভাষা ছিল না, সাহিত্য ছিল না, বিজ্ঞান ছিল না, ধর্ম্মশাস্ত্র ছিল না, তন্ত্রমন্ত্র ছিল না, পুরাণ, ইতিহাস ছিল না, কোথাকার কোন্ একটা পরভাষা লইয়া আমরা নাচিতে ছিলাম, ইষ্টমন্ত্র পর্য্যন্ত পরভাষায় গ্রহণ করিয়াছি, পরভাষায় মন্ত্র পড়িয়া ভূত ছাড়াইয়াছি। এখন আমাদের পাপ ছাড়িল, আমাদের ভাষা হইয়াছে, আমাদের ব্যাকরণ হইয়াছে!

ক্রমে দেখা গেল সেই ব্যাকরণে কোন কাজ হয় না। ক্রমে ৺রাজা রামমোহন রায়কে একখান ব্যাকরণ প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করা হয় এবং তাহা প্রণীত হওয়া মাত্র একদিনে চৌদ্দশত পুস্তক বিক্রীত হইয়া গেল। কারণ য়ুরোপীয়দের জন্ত একখান পূর্ণ ব্যাকরণের

তখন এতই অভাব ছিল যে বঙ্গভাষা-শিক্ষার্থী য়ুরোপীয়গণ ঐ ব্যাকরণের জন্ম উদ্গ্রীব হইয়াছিলেন এবং উহা পাইয়া কৃতার্থমন্য হইলেন। কিন্তু তাঁহারা এত আশা করিয়া এত আগ্রহের সহিত যে পুস্তক ক্রয় করিলেন উহা পাঠ করিয়া তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। এত বড়লোকে যে ব্যাকরণ লিখিলেন তাহাতেও কাজ হইল না দেখিয়া সকলে ক্ষুব্ধ ও হতাশ হইয়া গেলেন। তাহার পর ঐ পুস্তক আর একখানাও বিক্রীত হইল না। ইহার কারণ কি?

রাজা রামমোহন রায়ের ব্যাকরণও কার্য্যকরী হইল না কেন? তাহার কারণানুসন্ধান করিতে যাইয়া দেখিলাম, তিনিও ঐ ব্যাকরণ কেবল বাঙ্গলায় যাহা আছে অথচ সংস্কৃতে নাই তাহাই দেখাইয়াছেন মাত্র। আর কি লিখিবেন? সংস্কৃতব্যাকরণকে অনুবাদ করিয়া বাঙ্গলাব্যাকরণ আখ্যা প্রদান করিতে তাঁহার ভাল লাগে নাই, সেইজন্ম পরাকৃতের যে সকল বিধিব্যবস্থা সংস্কৃতে নাই তাহাই দেখাইয়া গিয়াছেন, আর সকল নিয়ম ত সংস্কৃত-ব্যাকরণেই আছে, তাহার অনুবাদ করিয়া ফল কি? সংস্কৃতও আমাদের বাঙ্গলাও আমাদের, ইহাদের একটীও আমরা ছাড়িতে পারিব না, তবে একের অনুবাদ করিয়া দুইটা ব্যাকরণ করিয়া লওয়া প্রয়োজন কি? তখন পর্য্যন্ত লক্ষিত বা অলক্ষিত ভাবে এইভাব উক্ত মহাত্মার অন্তরে ক্রিয়া করিতেছিল। তখন পর্য্যন্ত সংস্কৃত এবং প্রাকৃত যে এক ভাষারই সাহিত্যিক এবং কথিতাকার, এইভাব বাঙ্গালীহৃদয় হইতে এককালে উন্মূলিত হইয়া যায় নাই।

রাজা রামমোহনের ব্যাকরণ চলিল না। তাঁহার পর কত লোকে ব্যাকরণ লিখিলেন, কিথ্ সাহেব একখান ব্যাকরণ লিখিলেন, আমরা ষষ্ঠ শ্রেণীতে তাহা আট পয়সাতে কিনিয়া পড়িয়াছি। তাহার পর বড় বড় ব্যাকরণ বাহির হইতে লাগিল, তাহাদিগকে সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুবাদ বলিলেই হয়। সংস্কৃত ব্যাকরণ "সমানঃসবর্ণে দীর্ঘীভবতি পরশ্চ লোপং" তাহার বাঙ্গালা হইল "সবর্ণের পর সবর্ণ থাকিলে তাহা দীর্ঘ হয় এবং পরবর্ণ লোপ পায়"। যতই যাহা হউক, প্রকৃতপক্ষে "বাঙ্গলার" ব্যাকরণ হইল না, সহস্র চেষ্টাতেও হইতেছে না, ইহার কারণ কি? কারণ এই যে কথিতভাষার ব্যাকরণ হয় না এবং হইতে পারে না। কথিত ভাষা মধ্যে এত শত শত গুহ্য রীতি ও নিয়মাদি আছে যে তাহা সমগ্র উদ্ধার করিয়া লইতে হইলে ব্যাকরণ এত বৃহদাকার ধারণ করে যে তাহা শিক্ষা করা অসম্ভব হয়, আর কতকগুলি এরূপ নিয়ম আছে যে তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না, কেবল কথিত ভাষা শুনিয়া শুনিয়া শিক্ষা করিতে হয়। যাঁহারা অধুনা ব্যাকরণ লিখিতে চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা স্বয়ংই ইহা উপলব্ধি করিবেন। কথিত ভাষা প্রত্যেক যোজনে এক এক প্রকার, তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্য ও ব্যাকরণ হইতে পারে না। সাহিত্যের সার্ব্বজনিক ভাষা এক প্রকার এবং প্রাদেশিক বা স্থানীয় বা গ্রাম্যভ.বা অন্য প্রকার। সেই সকল প্রাদেশিক বা গ্রাম্যভাষাই কথিতভাষা, তাহা অস্থির, তাহার

এক এক স্থানে, এক এক সময়ে, এক এক রূপ হয়। সুতরাং তাহাদের ব্যাকরণ হয় না। সাহিত্যের ভাষা স্থির, তাহার ব্যাকরণ হইতে পারে এবং তাহাই হইয়া থাকে। তাহাতে কথিত ভাষার সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হয় না এবং অনেক বিষয় উপেক্ষা করিয়া যে কয়টী নিয়ম বিধিবদ্ধ হয়, পরবর্ত্তী সাহিত্যের ভাষা সেই কয়েকটী নিয়মাবলম্বনে এবং কথিত ভাষার অপ্রকটিত ব্যবহার দ্বারা অলক্ষিত ভাবে অল্প বা অধিক অনুশাসিত হইয়া চলিয়া থাকে। ভাষার আভ্যন্তরিক অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপার সাহিত্যের ব্যাকরণে থাকে না এবং সাহিত্যের ভাষাতেও থাকে না।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি ভাষার সকল নিয়ম ব্যাকরণে বিধিবদ্ধ হইতে না পারে তবে ব্যাকরণ প্রণয়নে ফল কি? তাহার উত্তর এই যে ব্যাকরণ না হইলে ভাষার স্থায়িত্ব রক্ষা করা যায় না। কথিত ভাষা চঞ্চল, তাহা কখন এক আকার, কখন অন্য আকার ধারণ করে। আমাদের পিতা পিতামহ পিতামহী যে প্রকার কথা বলিতেন আমরা সেই প্রকার বলি না। কিন্তু সাহিত্যের ভাষা স্থির হওয়া আবশ্যক, তাহা ঐ প্রকার অস্থির থাকিলে এককালের সাহিত্য অন্য কালে এবং এক প্রদেশের সাহিত্য অন্য প্রদেশে অবোধ্য হইয়া পড়ে। এই জন্য ব্যাকরণ ভাষাকে একটা বিশিষ্ট আকার প্রদান করে (It gives a definite shape to the language)। আ+কৃ+ক্তি = আকৃতি, বি অর্থ বিশিষ্টপ্রকার। ভাষাকে বিশিষ্টপ্রকার আকৃতি প্রদান করার নাম ব্যাকরণ; সাহিত্যের ভাষা তাহার নিয়মে চলিয়া স্থায়ী হয়, আর কথিত ভাষাও সেই নিয়মের দিকে চাহিয়া আপন স্বাভাবিক উচ্ছৃঙ্খলতাকে কথঞ্চিৎ প্রশমিত করে। সংস্কৃত আমাদের সাহিত্যের ভাষা, বাঙ্গলা তাহার কথিত আকার, অতএব বাঙ্গলাভাষা সংস্কৃত ব্যাকরণের দ্বারা প্রশমিত হইতে পারে এবং তাহা হইলেই ইহার কল্যাণ, আর সংস্কৃত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ইহাকে এক পৃথক্ ভাষা করিয়া তুলিলে উভয় ভাষাই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

রাজা রামমোহন রায় যে প্রাকৃত বা বঙ্গভাষার ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন তাহা প্রাচীন প্রাকৃত ব্যাকরণাবলম্বনে নহে, তিনি স্বাধীনভাবে স্বীয় চিন্তাশক্তিতে প্রাকৃতভাষার ব্যাকরণ যেরূপ হওয়া উচিত মনে করিয়াছিলেন সেই প্রণালীতে উহা লিখিয়াছিলেন। তাহাতে স্থূলতঃ বররুচি প্রভৃতির সহিত তাঁহার প্রণালী মূলতঃ এক প্রকার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বররুচি এবং রাজা রামমোহন এই দুইজন মহাপুরুষ সহস্রাধিক বর্ষ ব্যবধানে জন্মগ্রহণ করিয়া আপন আপন স্বাধীন বুদ্ধিতে যে দুইখান ব্যাকরণ লিখিলেন তাহাদের প্রণালী মূলতঃ এক হইয়া দাঁড়াইল, ইহাতে কি স্বভাবের ক্রিয়া পরিলক্ষিত হইতেছে না? ইহার কারণ এই যে বঙ্গভাষা সংস্কৃতের এক প্রকার কথিতাকার, সুতরাং তাহার ব্যাকরণে সংস্কৃতে যাহা নাই তাহা প্রদর্শিত হইবে। তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসঙ্গী হইতে পারে, স্বতন্ত্র ব্যাকরণ হইতে পারে না।

ব্যাকরণের ন্যায় অভিধানও সাহিত্যিক ভাষারই হইয়া থাকে। যে সকল শব্দ

মার্জ্জিত বা সংস্কৃত হইয়া সাহিত্যে ব্যবহারের উপযুক্ত হইয়াছে, সেই সকল শব্দই অভিধানে স্থান প্রাপ্ত হয়, আর যে সকল শব্দ মার্জ্জিত হইয়া সাহিত্যিক আকার প্রাপ্ত হয় নাই তাহারা অভিধানে স্থান প্রাপ্ত হয় না। এই কারণে প্রকৃতির ব্যবহৃত অর্থাৎ কথিতভাষায় প্রচলিত অনেক শব্দ অভিধান হইতে বর্জ্জিত রহিয়াছে। যেমন "চীচীকরা" এই শব্দটী হইতে স্বরবিপর্য্যয়ে "চাচীকার", তাহা হইতে "চীচ্কার", আবার তাহাই আরও একটু মার্জ্জিত বা সংস্কৃত হইয়া "চীৎকার" রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। এই মার্জ্জিত বা সংস্কৃত রূপটাই সাহিত্যে ব্যবহৃত হইতে পারে এবং এই জন্য অভিধানে উঠিতে পারে, কিন্তু "চাচীকরা", "চীচ্কার" প্রভৃতি শব্দ অমার্জ্জিতাবস্থায় থাকায় তাহারা সাহিত্যে কিংবা অভিধানে স্থান পাওয়ার যোগ্য নহে।

উপরোক্ত প্রকারে সাহিত্যে নিগৃহীত প্রাকৃত শব্দ মধ্যে কোন কোন শব্দ অতি প্রাচীন। তাহারা সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধানের সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতে কথিত ভাষায় প্রচলিত আছে, যেমন লাদ, টিপ, ইত্যাদি। আমাদের মেয়েরা টিপ পরে with tip of the finger. হিন্দিতে লাদ বলে তাহার অর্থ to load, আর লদ অর্থ "to be loaded. Anglo Saxon 'hladan' = to load, hlad = a load" (Beams' Comp. Grammar Vol 11. p. 61.) এই সকল শব্দ ভারতবর্ষ এবং য়ুরোপ উভয় স্থানের আর্য্যভাষাতে প্রচলিত থাকায়, জানিতে পারা যায় যে, এদেশ এবং সে দেশের আর্য্যগণের একত্রবাসের সময় হইতে ঐ সকল শব্দ কথিত ভাষায় চলিতেছে অথচ সংস্কৃতে তাহাদের ব্যবহার নাই। বাঙ্গলা যে সকল শব্দকে আমরা সংস্কৃতের সহিত মিলাইতে পারি না, তাহার মধ্যে হয়ত অনেক এই শ্রেণীর শব্দ আছে। তাহারা ভাষান্তর হইতে গৃহীত নহে।

আর কতক শব্দ আছে তাহারা আনুকরণিক, যেমন ঢেক্ ঢেক্ শব্দ হইতে ঢেকী, কড় কড় শব্দ হইতে কড়া প্রভৃতি। কথিত ভাষায় ব্যবহৃত অথচ সংস্কৃতে উপেক্ষিত শব্দাদি প্রায় সমস্তই আনুকরণিক, কিন্তু কোন্‌টী কোন্ শব্দের অনুকরণে উৎপন্ন তাহা এখন নির্ণয় করা কঠিন, অথবা অসম্ভব। শব্দানুকরণ দ্বারাই যে ভাষার পুষ্টি হয়, তাহা অন্য প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। সেই আনুকরণিক শব্দগুলিকে চিনিতে না পারিয়া, তাহাদিগকে ভাষান্তর হইতে গৃহীত শব্দ বলিয়া মনে করা সঙ্গত নহে। খাইতে মুড় মুড় শব্দ হয় তাহা হইতে 'মুড়ি", মুড়ি ভাজিতে যে কুঁচি দ্বারা আলোড়ন করিতে হয়, সেই আলোড়নে পিস্ পিস্ শব্দ হয়, তাহা হইতে তাহার নাম পূর্ব্ববঙ্গে পিছি। ক্ষুদ্রার্থে ইকার এবং বৃহদর্থে আকার, এই জন্য বৃহৎপিছি যদ্দ্বারা গৃহসম্মার্জ্জন করা যায়, তাহার নাম পূর্ব্ববঙ্গে পিছা, পিছির ন্যায় গঠিত, হয়ত এই জন্য চামরের নাম "পিছিকা"। দেখিতে চামরের ন্যায় "ময়ূরপিচ্ছ"। অতএব মুড়ি, পিছা, পিছি ইত্যাদি আনুকরণিক শব্দ সকলকে না চিনিয়া ভাষান্তর হইতে গৃহীত বলিয়া মনে করা ভাষার পক্ষে নিতান্ত অনিষ্টজনক।

বিপদাশঙ্কা হইলে, অথবা দূরস্থ বন্ধুকে আহ্বান করিতে হইলে পাখীগণ চীচী রব করে,

তাহা হইতে চীচীকার চীচ্কার—চীৎকার। এই প্রকারে প্রাকৃত চীচী সংস্কৃত হইয়া এই রূপ ধারণ করিয়াছে। আমরা যে চীচী হইতে চীচান বা চেচান বলি, তাহা উক্ত প্রকারে মার্জ্জিত বা সংস্কৃত হয় নাই বলিয়া তাহাকে অনার্য্য ভাষা বা ভাষান্তর মনে করা উচিত নহে। কবি গানে অত্যুচ্চ স্বরকে বলে "চিতান" তাহারও মূল এই চীচী, কারণ ভাষাতত্বে "বর্ণান্তর" শীর্ষক পরিচ্ছেদে দেখান গিয়াছে ত=চ। এই প্রকার, আদিমাবস্থার কথিত ভাষা প্রায় সমস্তই আনুকরণিক, তাহারা কতকগুলি মার্জ্জিত হইয়া সংস্কৃতাকার প্রাপ্ত হইয়াছে, আর কতকগুলি সাহিত্যে নিগৃহীত হইয়া অমার্জ্জিত অবস্থায় এখন পর্য্যন্ত কথিত ভাষায় প্রচলিত আছে, সংস্কৃতে নাই। তাহাদিগকে অভিধানে না পাইয়া লোকে অনার্য্য ভাষার শব্দ মনে করে।

অনেকের মুখেই এখন শুনিতে পাওয়া যায় যে পরভাষা হইতে যত অধিক শব্দ আনিয়া ব্যবহার করা যায় ততই ভাষার উন্নতি। কিন্তু ইহা অন্য ভাষার পক্ষে হইতে পারে, সংস্কৃত বা তাহার প্রাকৃত ভাষার পক্ষে নহে। পর ভাষার শব্দ গ্রহণ করা যদি ভাষার উন্নতি হয়, তবে ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ নিত্যই ভাষার এই প্রকার "উন্নতি" করিতেছে। পূর্ব্বে মুসলমান রাজত্ব সময়ে এই প্রকার বহু "উন্নতি" হইয়াছিল। জিন্দিগি, ভোর, হারাম-জাদা, বেকসুর, হরদম ইত্যাদি প্রতি দশ শব্দে পাঁচ শব্দই আরবি, পার্শী ছিল। আমরা বাল্যকালে তপ্তজল, তপ্ত ভাত ইত্যাদি বলিতাম। স্ত্রীলোক, বালক, ইতর সাধারণ লোক সকলেই তাহা বলিত। কিন্তু কর্ত্তারা গরম জল, গরম ভাত বলিতেন। আজ কাল আর তপ্ত জল, তপ্ত ভাত কাহাকেও বলিতে শুনি না, সকলেই গরম বলে। বালকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে বলে, কৈ? তপ্তভাত কে কবে বলিয়া থাকে? অতএব এই শব্দটী দেখিতে দেখিতে বিলুপ্ত হইয়া গেল। আর কিছু দিন পরে কেহ তপ্ত জল বলিলে লোকে তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিবেক "সংস্কৃত বলিতেছেন!" ইহা যদি উন্নতি হয় তবে দুর্গতি কাহাকে বলিব?

লেখনী, কঠিনী, এই দুইটী সংস্কৃত শব্দ আছে। আমরা বলি কলম, তাহা মুসলমানী শব্দ। এখন জিজ্ঞাসা করি মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্বেত আমরা দোয়াত কলম ব্যবহার করিতাম, তখন আমরা তাহাদিগকে কি বলিতাম? সম্ভবতঃ তখন লেখন বা লেখনী এবং কঠিনী বা কাঠী বলিতাম, কিন্তু আমাদের "ভাষোন্নতিতে" সেই সকল শব্দ কথিত ভাষা হইতে তিরোহিত হইয়াছে। এখন যদি কেহ তাহাদের ব্যবহার করিতে চাহে লোকে চক্ষু টানিয়া ইঙ্গিত করিবেক, "সংস্কৃত বলিতেছেন!"

লোকে মনে করে যত অধিক শব্দ অন্য ভাষা হইতে গৃহীত হয়, ততই ভাব প্রকাশের সুবিধা হয়। কিন্তু ভাব তাহার ভাষা লইয়াই স্ফুরিত হয়। যখন মনে একটী ভাব আসে, সে তাহার ভাষা লইয়াই আসে; সুতরাং যে ভাব আপনা হইতে অন্তরে উদয় হয় তাহা প্রকাশ করিবার জন্য ভাষা অন্বেষণ করিতে হয় না। তাহার ভাষা আপনা হইতেই

আসে। আর অন্যের নিকট হইতে কোন একটী ভাব অন্য ভাষাতে শিক্ষা করিয়া তাহা স্বীয় ভাষায় প্রকাশ করিতে চাহিলে তাহাই কঠিন হয়। এই জন্য পুস্তক লেখা অপেক্ষা তাহার অনুবাদ করা কঠিন। নিজের ভাব সহজে প্রকাশ করা যায়, পরের ভাব প্রকাশ করা কঠিন। এই কারণে পর ভাষা হইতে ভাব গ্রহণ করিতে হইলেই পর ভাষার শব্দ ব্যবহার করিতে প্রবৃত্তি হয়। তখন সেই ভাষার শব্দই আসিয়া সম্মুখে দাঁড়ায়, এবং তাহার ছায়াতে স্বীয় ভাষার শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহাকে ছাড়াইয়া ভাবটীকে নিজস্ব করিয়া লইলেই নিজ ভাষা আসিয়া উপস্থিত হয়।

অনেক সময় আমরা যে স্বীয় ভাষাকে অপ্রচুর মনে করি তাহার একমাত্র কারণ পর ভাষার অনুবাদ করার কাঠিন্য। ভাব স্বতঃ উদ্ভূতই হউক, আর মার্জ্জিতই হউক সে তাহার ভাষা গঠন করিয়া লইবেক, পরভাষা হইতে কোন শব্দ গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন রাখে না। স্বকীয় হউক বা পরকীয় হউক, অন্তরে যত ভাব সঞ্চয় হয়, ভাষা তাহার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই প্রকারে ভাষায় যে সংবৃদ্ধি হয় তাহাকেই ভাষার উন্নতি বলা যায়।

অন্যের নিকট যাহা শুনি তাহাতে আমার হৃদয়-নিহিত ভাবকে উদ্রিক্ত করিয়া দেয় মাত্র, অন্যের ভাবটী সশরীরে আসিয়া আমার হৃদয়ে বসিতে পারে না। আমার হৃদয়ে যে ভাব নাই তাহা আমাকে কেহ দিতে পারে না, যে ভাব আছে তাহার ভাষাও আছে, তাহার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভাষাও উদ্রিক্ত হয়। সকল ভাষাই বর্দ্ধনশীল ভাববৃদ্ধি হইলেই ভাষার সমৃদ্ধি হয়। কোন জাতি উন্নত-ভাব-সম্পন্ন, অথচ তাহার ভাষা অপ্রচুর বা অনুন্নত এরূপ হইতে পারে না। যে জাতি ভাবধনে ধনী তাহার ভাষাও ধনী। অতএব পরভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ করা ভাষার উন্নতি নহে। তাহা ভাষার বিকৃতি।

পরের দ্রব্য ব্যবহার করা সর্ব্বাপেক্ষা সহজ। নিজস্ব অর্জ্জন করা আয়াসসাধ্য। উন্নতি অনায়াসে হয় না, ইহা কষ্টসাধ্য, আর অবনতি অনায়াসলব্ধ। উন্নতি অবনতির এই লক্ষণ প্রত্যেক বিষয়ে প্রযুক্ত হয়। অতএব ভাষার উন্নতি যদি অনায়াসে করা যায় দেখি তবে সেই লক্ষণ দ্বারাই জানিতে পারিব উহা উন্নতি নহে, উহা অবনতি।

প্রণিধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, কথিত ভাষায় ইতর সাধারণ লোকের মুখে নূতন নূতন শব্দ ও প্রত্যয়াদি নিত্য জন্মিতেছে। জল বিম্ববৎ তাহারা যেমন উদ্ভূত হয় তেমনি লয় প্রাপ্ত হয়। সেই সকল শব্দাদি সাহিত্যের উপযুক্ত নহে, এই জন্য সাহিত্যে গৃহীত হয় না। যেমন আমরা বলি দুপয়সার টিকিট দশ খানা, এক পয়সার টিকিট পাঁচ খানা, ইত্যাদি, কিন্তু কোন স্থানে কোন লোকের মুখে শুনিয়াছি দুপয়সানে টিকিট এক পয়সানে টিকিট। এই শ্রেণীর প্রত্যয় বা শব্দ সাহিত্যে ব্যবহার্য্য নহে। পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি কথিত ভাষার অভিধান হয় না, কারণ তাহা অস্থায়ী। সাহিত্যের ভাষা স্থায়ী এই জন্য তাহারই ব্যাকরণাদি হইতে পারে এবং হইয়া থাকে। অতএব কথিত ভাষার

যে সকল শব্দাদি সাহিত্যে ব্যবহারের অযোগ্য, সেই সকল শব্দ সঙ্কলন করিয়া অভিধানের কলেবর বৃদ্ধি করা, অথবা সেই সকল শব্দ সাহিত্যে ব্যবহার করা ভাষার উন্নতিসাধক নহে।

আমরা স্বীকার করি যে উচ্চ সাহিত্যে অর্থাৎ সংস্কৃতে ঐ সকল শব্দাদি গ্রাম্য ভাষা বলিয়া এককালে বর্জ্জিত হইলেও নিম্নসাহিত্যে অর্থাৎ বাঙ্গলাদি প্রাদেশিক বা গ্রাম্যসাহিত্যে দুই চারিটী গ্রাম্য বা প্রাদেশিক শব্দ ব্যবহৃত হওয়া অস্বাভাবিক বা অমার্জ্জনীয় নহে; কিন্তু মার্জ্জনীয় হইলেও তাহাদের ব্যবহার যত অল্প হয় তাহাই বাঞ্ছনীয়। কথিত ভাষার যে সকল শব্দে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের দ্বারা বিভিন্নরূপে কথিত হয়, তাহারা যে পর্য্যন্ত স্থিররূপ ধারণ না করে, সে পর্য্যন্ত তাহারা সাহিত্যে ব্যবহার্য্য নহে। যাহা মুখে আসে তাহাই সাহিত্যে ব্যবহার করা ভাষার উন্নতিজনক নহে। আমাদের বাঙ্গলাদি নিম্নসাহিত্যের স্বাভাবিক গতি উচ্চ সাহিত্যের দিকে, তাহা না হইয়া যদি উচ্চসাহিত্য অর্থাৎ সংস্কৃত হইতে আরও সরিয়া যাইতে প্রবৃত্ত হয়, তবে তাহাকেই আমরা বিকৃতি বা অবনতি বলি।

শ্রীশ্রীনাথ সেন।

প্রাচীন-পদাবলী ও পদকর্তৃগণ

প্রচলিত পদাবলীর সংগ্রহ-গ্রন্থ সকলের মধ্যে মহাত্মা বৈষ্ণবদাসকর্তৃক সঙ্কলিত পদকল্পতরু গ্রন্থই বৃহত্তম বটে। ইহাতে শতাধিক পদকর্তৃগণের নামাঙ্কিত পদাবলি সংগৃহীত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন তাহাতে ভণিতাহীন বহু সংখ্যক পদও উদ্ধৃত হইয়াছে। অপরাপর গ্রন্থের প্রমাণের সাহায্যে ভণিতাহীন পদের রচয়িতৃগণের মধ্যে কয়েকজনের নাম জানিতে পারা গিয়াছে।

বৈষ্ণবদাসের এই পদ-সংগ্রহ কিরূপ বিস্তৃত ও তাঁহার অসামান্য অনুসন্ধান ও ক্ষমতার পরিচায়ক তাহা সহজেই প্রতীত হইতে পারে। জয়দেব, বিদ্যাপতি, ও চণ্ডীদাস ব্যতীত পদকল্পতরুর কবিগণই মহাপ্রভুর সমসাময়িক অথবা পরবর্ত্তী। মহাপ্রভু ১৪০৭ শকে বা ১৪৮৬ খৃঃ অব্দে আবির্ভূত হন। বৈষ্ণবদাস সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন। সুতরাং বৈষ্ণবদাস পদাবলীর সৃষ্টি হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্য্যন্ত যে সকল কবি পদ রচনা করিয়াছেন তাঁহাদের অধিকাংশের পদই সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। পদ-কল্পতরুর কবিগণের নামের সুদীর্ঘ তালিকা দেখিলে বোধ হয় বৈষ্ণবদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী ও সমসাময়িক প্রায় কোন কবির উল্লেখযোগ্য কোন পদই বৈষ্ণবদাসের বিরাট সংগ্রহে পরিত্যক্ত হয় নাই। বলা বাহুল্য যে, যে কালে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন ছিল না—পদা-

বলী সকল প্রধানতঃ কেবল মুখে মুখে গীত হইয়া প্রচারিত হইত কদাচিৎ কোন সহৃদয় পণ্ডিত ব্যক্তি কিংবা কীর্ত্তনিয়া তাহা লিখিয়া রাখিতেন, সেই সময়ে বৈষ্ণবদাস তাঁহার এই বিরাট সংগ্রহে প্রবৃত্ত না হইলে—এত দিনে উক্ত পদাবলী মধ্যে অধিকাংশই যে বিস্মৃতি-সাগরে বিলীন হইত, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। বৈষ্ণবদাস নিজেও পদকর্ত্তা ছিলেন—কিন্তু তিনি চিরকাল অদ্বিতীয় পদ-সংগ্রহকার বলিয়াই বৈষ্ণবসমাজে সমাদৃত। পদাবলীর সংগ্রহ-গ্রন্থ মধ্যে বৈষ্ণবদাসের পদকল্পতরু নানা বিষয়ে অতি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে।

বৈষ্ণবদাসের পূর্ব্বে শ্রীনিবাস আচার্য্যের পৌত্র শ্রীরাধামোহন ঠাকুর—"পদামৃতসমুদ্র" নামক গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। বৈষ্ণবদাস পদকল্পতরুর অনুবাদ প্রকরণে লিখিয়াছেন—

"আচার্য্য প্রভুর বংশ শ্রীরাধামোহন।
কে কহিতে পারে তাঁর গুণের বর্ণন।
* * * *
গ্রন্থ কৈলা পদামৃতসমুদ্র আখ্যান।
জগতে আমার লোক তাহা করি গান॥"

পদকল্পতরুর পদসংগ্রহ সম্বন্ধে বৈষ্ণবদাস লিখিয়াছেন—

"নানা পর্য্যটনে পদ সংগ্রহ করিয়া।
তাঁহার যতেক পদ সব তাহা লৈয়া॥
সেই মূলগ্রন্থ অনুসারে ইহা কৈল।
প্রাচীন প্রাচীন পদ যতেক পাইল॥"

রাধামোহন ঠাকুরের "পদামৃত-সমুদ্র" পদকল্পতরু অপেক্ষা আকারে অনেক ক্ষুদ্র। পদকল্পতরুর পদ-সংখ্যা ৩১০১।* পদামৃত-সমুদ্রের পদ-সংখ্যা ৭০৬টি মাত্র। তন্মধ্যে রাধামোহন ঠাকুরের স্বকৃত পদ ২২৮টী আছে। পদকল্পতরু গ্রন্থে বৈষ্ণবদাস ২৫টীর অধিক স্বরচিত পদ সন্নিবিষ্ট করেন নাই। পদামৃতসমুদ্রে মোটে ৩৫ জন কবির পদ সংগৃহীত হইয়াছে; পদকল্পতরুতে একই নামের বিভিন্ন উপাধিযুক্ত ব্যক্তিগণকে একই ব্যক্তি বলিয়া ধরিয়া লইলেও ইহাতে ১১৬ জন বিভিন্ন পদকর্ত্তার পদ সংগৃহীত হইয়াছে, এতদ্ব্যতীত দুই শতের অধিক ভণিতাহীন পদও আছে, সুতরাং পদামৃতসমুদ্র হইতে পদকল্পতরুর সংগ্রহ যে কত প্রকাণ্ড ও মূল্যবান্ তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। এই জন্যই

* পদকল্পতরুর মুদ্রিত ও হস্তলিপিগ্রন্থসমূহে ৩১০১ পদের স্থলে ৩০২৩ কিংবা তাহার কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক পদ-সংখ্যা দৃষ্ট হয়। পদকল্পতরুর চতুর্থশাখার ৯ম পল্লবে যে কতকগুলি "বারমাসী" পদ সংগৃহীত হইয়াছে তাহার প্রত্যেক পদকে ১২টি পদ গণনা করিয়াই বৈষ্ণবদাস ৩১০১ পদ-সংখ্যা নির্দ্দেশ করায় এই আপাত-বৈষম্য দৃষ্ট হইতেছে। আমরা বৈষ্ণবদাসের পদাবলি ও তাঁহার সংগ্রহগ্রন্থ পদকল্পতরুর বিস্তৃত সমালোচনার সময়ে এ সম্বন্ধে বিশেষরূপে আলোচনা করিব।

বৈষ্ণবদাসের পূর্ব্বে ও পরে আরও অনেক ব্যক্তি অনেক সংগ্রহ-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া থাকিলেও পদকল্পতরু গ্রন্থই এ বিষয়ে সর্ব্বোত্তম স্থান অধিকার করিয়াছে।

হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় নানা পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়া প্রকাশ করেন যে, জ্ঞানদাসের সহচর বাবা আউল মনোহরদাসই সকলের পূর্ব্বে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে পঞ্চদশ সহস্র পদপূর্ণ পদ-সমুদ্র নামে একটী অতি বৃহৎ পদ-সংগ্রহ করেন। ভক্তিনিধির এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া আজ কাল অনেকেই "পদ-সমুদ্রকে" সকল সংগ্রহগ্রন্থ-মধ্যে প্রাধান্ত দিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। কিন্তু নানা কারণে পদসমুদ্রের প্রামাণিকতায় উপর আমাদিগের ঘোরতর সন্দেহ জন্মিয়াছে। মনোহরদাস শ্রীনিবাস আচার্য্যের সমকালীন ব্যক্তি। তিনি জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভৃতির সমভিব্যাহারে খেতুরীর মহোৎসবে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মনোহরদাসকর্ত্তৃক এইরূপ বিরাট সংগ্রহ-গ্রন্থ সংকলিত হইয়া থাকিলেও রাধামোহন ঠাকুর, নরহরি (গীতচন্দ্রোদয়ের প্রণেতা) বা বৈষ্ণবদাস কেহই এই গ্রন্থের বিষয় জানিতেন না। রাধামোহন ঠাকুর পদামৃতসমুদ্রের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—

'যেস্থলে প্রাচীন পদকর্ত্তাদিগের গানের পোষকপদ প্রাপ্ত হন নাই সেখানে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে পদ রচনা করিয়া দিতে হইয়াছে।' রাধামোহন ঠাকুর সহজে স্বকৃতপদ দ্বারা গ্রন্থ পরিপূর্ণ করেন নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে রাধামোহন ঠাকুর ৩৫ জন কবির মাত্র পদ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন ও তাঁহার পদ সংখ্যা মাত্র ৭৩৬টী। অথচ ইহার বহুকাল পূর্ব্বে মনোহর দাস ১৫ হাজার পদপূর্ণ (পদকল্পতরু গ্রন্থের প্রায় ৫ গুণ বড়) বিরাটগ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন ইহা সহজে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। মনোহরদাস নিজে বিখ্যাত পদকর্ত্তা ছিলেন না। তাঁহার রচিত ৬টী পদ মাত্র পদকল্পতরুতে গৃহীত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় তাঁহার স্বরচিত পদদ্বারা এইরূপ বিরাটগ্রন্থের কলেবর পূর্ণ করাও বড় সম্ভবপর নহে। বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণ পরগুণ-গ্রহণে কখনও কুণ্ঠিত ছিলেন না, তাঁহারা অতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রাচীন গ্রন্থকারগণের গ্রন্থাদির নাম লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, এরূপ অবস্থায় তাঁহারা যে এইরূপ বিরাটগ্রন্থের বিষয় ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ করেন নাই, ইহা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সুতরাং আমাদের সন্দেহ হয় যে পঞ্চদশ সহস্র পদাত্মক কোন বিরাটগ্রন্থের অস্তিত্ব থাকিলে তাহা কোন পরবর্ত্তী ব্যক্তির সঙ্কলিত ও অকিঞ্চিৎকর পদাবলীতে পূর্ণ হওয়াই সম্ভব। অতএব অপর বৃহত্তর ও উৎকৃষ্টতর সংগ্রহ-গ্রন্থের অভাবে আমরা পদকল্পতরুতে সংগৃহীত পদাবলী অবলম্বনেই প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্ত্তৃগণের সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। পদাবলীর অধিকাংশ রচয়িতৃগণের জীবনীসম্বন্ধে অধিক কিছু জানিবার উপায় নাই। পদকর্ত্তৃগণের মধ্যে যাঁহারা মহাপ্রভুর সমকালীন ও পার্শ্বচর ছিলেন তাঁহাদিগের নাম "চৈতন্যভাগবত" ও "চৈতন্যচরিতামৃত" প্রভৃতি গ্রন্থে প্রসঙ্গতঃ উল্লিখিত হইয়াছে। মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের পরে গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাস, বসন্তরায়

প্রভৃতি যে সকল প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তৃগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, প্রসঙ্গক্রমে শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য ঘনশ্যাম নরহরির "ভক্তিরত্নাকর" ও "নরোত্তমবিলাস" ও নিত্যানন্দ দাসের "প্রেম-বিলাস" ও কৃষ্ণদাসের "ভক্তমালে" তাঁহাদিগের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু এই সকল বিবরণ এত সামান্য যে তাহা হইতে তাঁহাদিগের জীবনচরিত অতি অল্পই জানা যাইতে পারে। পদকল্পতরুর পদকর্ত্তৃগণ মধ্যে যাঁহার সম্বন্ধে যতটুকু জানিতে পারিয়াছি, তাহা আকারাদিক্রমে কবিগণের নামের পরে তাঁহাদিগের পদসমষ্টি ও পদ সংখ্যার সহিত প্রদত্ত হইবে।

(১)

অজ্ঞাত পদকর্ত্তৃগণ।

প্রায় সকল পদকর্ত্তাই প্রাচীন রীতির অনুকরণে স্বীয় পদাবলীর শেষভাগে স্বনামাঙ্কিত ভণিতাসংযুক্ত করিয়াছেন। কদাচিৎ এই প্রথার অন্যথাও দৃষ্ট হইয়া থাকে। পদকল্পতরু গ্রন্থে যে সকল ভণিতাহীন পদ দৃষ্ট হয়, উহাদের রচয়িতৃগণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বকই সেইরূপ পদ রচনা করিয়াছেন অথবা এইসকল পদাবলী পূর্ব্বকালে কেবল মুখে মুখে গীত হইত বলিয়া কাল সহকারে তাহাদের ভণিতা লুপ্ত হইয়াছে, তাহা এক্ষণ স্থির করা একরূপ অসম্ভব। পদাবলীর অন্যান্য অংশ মনোহর রচনা ও কবিত্বের জন্য সজীব থাকা যেরূপ সম্ভবপর, ভণিতাংশ সেইরূপ নহে। ইতিহাস-পরাঙ্মুখ ভাবগ্রাহী সাধারণ শ্রোতৃগণের নিকট ভণিতার মূল্য অতি সামান্য। এইজন্যই দেখিতে পাওয়া যায় যে অনেক প্রাচীনপদের রচয়িতার সম্বন্ধেও অনেক মতভেদ আছে। প্রাচীন লেখক ও কীর্ত্তনিয়াগণ অনেক সময় সুবিধাসত্ত্বেও প্রকৃত রচয়িতার নাম ধাম জানিবার চেষ্টা না করিয়া "যথাদৃষ্টং তথা লিখিতং" এই সরলনীতির আশ্রয় লইয়াছেন। যাহা হউক পদকল্পতরুর কতকগুলি পদে ভণিতা না থাকার বিশিষ্ট কারণ আছে। পদকল্পতরু গ্রন্থে গ্রন্থান্তর হইতে কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। সংস্কৃত শ্লোকাবলিকে প্রকৃতপক্ষে পদ বলা যায় না; উহাতে ভণিতা যোগ করা সুবিধাজনক নহে এবং সেইরূপ প্রথাও নাই। দৃষ্টান্তস্থলে জয়দেবকৃত গীতগোবিন্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে। জয়দেবই সর্ব্বপ্রথমে সংস্কৃতে গীতের আকারে পদ রচনা করিয়াছেন। গীত-গোবিন্দের সঙ্গীতাত্মক পদগুলি সর্ব্বত্রই ভণিতাযুক্ত—কিন্তু শ্লোকাবলীতে কুত্রাপি ভণিতাসংযুক্ত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাবলী প্রকৃত পদ না হইলেও উহা রাগ রাগিণী সহকারে গীত হইতে পারে। বোধ হয় পূর্ব্বে পুরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ এমন কি কাব্যাদি পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সুর-সংযোগে পঠিত হইত। আমাদিগের দেশে চণ্ডী প্রভৃতি গ্রন্থ অদ্যাপি সেইরূপে পঠিত হইয়া থাকে। উড়িষ্যাদেশে রঘুবংশাদির মত কাব্যের শ্লোকগুলিও সুরসহকারে পঠিত হয়। পদকল্পতরু গ্রন্থেও কতকগুলি শ্লোক এইজন্য পদরূপে সংগৃহীত হইয়াছে। এইসকল শ্লোকের মধ্যে যে গুলির রচয়িতা আমরা স্থির করিতে পারিয়াছি, তাহা সেই সেই কবির নামে উল্লিখিত হইবে।

অবশিষ্টগুলি অজ্ঞাত কবিগণের পদাবলীর অন্তর্গত করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ ঐসকল শ্লোকও কোন না কোন সংস্কৃত বৈষ্ণবগ্রন্থ হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে, সুতরাং আশা করা যায় অনুসন্ধান দ্বারা সময়ে উহাদেরও রচয়িতা স্থির হইতে পারিবে।

অধিকাংশ ভণিতাহীন বাঙ্গালাপদ সম্বন্ধেই কিন্তু ইহা বলা যায় না। এই সকল পদের অধিকাংশই কোন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত নহে—সুতরাং তাহাদের রচয়িতার নাম ধাম জানিবার সহজ কোন উপায় নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজের সুপ্রসিদ্ধ চৈতন্যচরিতামৃত হইতে পদ-কল্পতরুতে যে কয়েকটী ভণিতাহীন পদ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা আমরা উক্ত কবিরাজের নামাঙ্কিত করিয়াছি।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে পরবর্ত্তী লেখকগণের প্রমাদবশতঃই এইসকল পদাবলীর অধিকাংশের ভণিতা পরিত্যক্ত হইয়াছে; কিন্তু পদসংগ্রহকার বৈষ্ণবদাসের সময়েও যে অনেকগুলি পদের ভণিতা ছিল না তাহা বৈষ্ণবদাস পঞ্চবিংশতি পল্লবের মধ্যভাগে লিখিয়াছেন, যথা—

"অথ শ্রীসংকীর্ত্তনানুসারেণ গীতসংগ্রহঃ।
তত্র সকলেষু পদেষু ভণিতা নাস্তি" ইত্যাদি ৯৯৩ পৃষ্ঠা।

(মৎ সম্পাদিত পদকল্পতরু দ্রষ্টব্য)

সে যাহা হউক এইসকল পদের ভণিতা না থাকায় তাহাদের কবিত্ব আস্বাদনের কোন ব্যাঘাত হইবে না, সহৃদয় পাঠকগণ জানেন যে অনেক সময়ে অনেক অকিঞ্চিৎকর পদাবলি—লেখকমহাশয়দিগের অনুগ্রহে—বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত হইয়া— রসগ্রাহী নিরপেক্ষ সমালোচকগণেরও মতি বিভ্রম ঘটাইয়াছে; সুতরাং পদাবলির প্রকৃত গুণ-বিচারের জন্ম বিংশ শতাব্দীর নিরপেক্ষ সমালোচক বোধ হয় কবিগণের ভণিতাহীন পদাবলি পাঠ করাই বাঞ্ছনীয় মনে করিবেন। এরূপ অবস্থায় একটু স্বচ্ছন্দ-চিত্তে ভণিতাহীন পদগুলির কবিত্ব সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলা অসঙ্গত হইবে না। বলা বাহুল্য যে দুই শতের অধিক ভণিতাহীন পদের মধ্যে উত্তম ও অধম নানারূপ কবিতাই দৃষ্ট হয়। উত্তম পদাবলীর মধ্যে কতকগুলি বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতির উৎকৃষ্ট কবিতা হইতে কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে।

"কি কহিব মাধব বুঝই না পারি।
কিসে ধনী বালা কিয়ে বরনারী॥" (৬২ পৃঃ)

ইত্যাদি বয়ঃসন্ধির পদটি বিদ্যাপতির অনুকরণ বটে, কিন্তু তাঁহার পক্ষেও অনুপযুক্ত নহে। বিদ্যাপতির নামাঙ্কিত হইলে ইহা নিঃসন্দেহ তাঁহার রচিত বলিয়া চলিয়া যাইত। ৬৯৮ সংখ্যক কবিতাটী সম্বন্ধেও এ কথা খাটে।

"সুবল মিতাহে কি কব সে সব রঙ্গ" (১৯২)

ইত্যাদি রসোদ্গারের পদটী শ্রেষ্ঠ কবিগণের অযোগ্য নহে। ২৭৪।৫১৯।৬০৭।৬৭৪।৭৭৭। ৭৮৩।৭৯০।৭৯৪।৮৪৪,৯৩৩।১১৭১।১২৯১।১৩৫৭।১৯১৭ সংখ্যক পদগুলি সম্বন্ধেও এই কথা বলা

যাইতে পারে। ১৫১২ ও ২৬৬৪ সংখ্যক পদ দুইটি বিদ্যাপতির সমালোচকগণের বিশেষ দ্রষ্টব্য। পণ্ডিতবর গ্রিয়ারসন সাহেবের সংগৃহীত বিদ্যাপতির মৈথিল পদাবলীর ৩৭ সংখ্যক কবিতাটির সহিত এই পদ দুটির সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। পদকল্পতরুর পদ দুটি একটি পদেরই বিভিন্ন পাঠান্তর। প্রথমাংশ উভয়েরই একরূপ কেবল শেষাংশ বিভিন্ন। ২৬৬৪ সংখ্যক পদে "মাধবকেলি বিলাসে" এই পংক্তি হইতে সমাপ্তি পর্য্যন্ত "পদামৃতসমুদ্রের" পাঠ অবিকল গৃহীত হইয়াছে। গীতচিন্তামণিতে এই শেষ অংশ প্রায় গ্রিয়ারসন সাহেবের পাঠের স্থায় যথা,—

সখিহে কেশবকেলিবিলাসে।
মালতী রমি অলি নাহি আগোরলি,
পুন রতি রঙ্গক আশে।
বদন মিলাই ধরল মুখ-মণ্ডল
চান্দ মিলল অরবিন্দ।
চকোর ভ্রমর দুহু দুহু আনন্দিত
পিবি অমিয়া মকরন্দ।

গী-চি ১৩শ ক্ষণদা।

গ্রিয়ারসন সাহেবের পুস্তকে যথা—

সখিহে মাধব কেলি বিলাসে।
মালতি রমি অলি নাহি আগোরলি
পুন রতি রঙ্গক আশে॥
বদন মিলায় ধরল মুখ-মণ্ডল
কমল বিমল জনি চন্দা।
ভ্রমর চকোর দুঅ ও অলসাএল
পীবি অমিঅ মকরন্দা॥ ৫৪ পৃঃ

ইহার পরে এইরূপ ভণিতা দেখা যায় যথা—

"ভণহি বিদ্যাপতি, শুনহ মধুর পতি,
রাধা চরিত অপারে।
রাজা শিবসিংহ, রূপনারায়ণ,
প্রাণবতী কণ্ঠহারে॥"

পদটীর প্রথমাংশ সকল পুস্তকেই এক রূপ। গ্রিয়ারসন সাহেবের প্রকাশিত বিদ্যাপতির যে কয়েকটী পদাবলীর সহিত বঙ্গদেশের প্রচলিত বিদ্যাপতির নামাঙ্কিত পদাবলীর সাদৃশ্য দেখা যায়, তন্মধ্যে এই পদ একটী। বিদ্যাপতির পদাবলী বৈষ্ণব কবি ও লেখকগণের হস্তে পড়িয়া কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছে, এই পদটীর তুলনা দ্বারা আমরা তাহার কতকটা

নমুনা পাইতে পারি। সে যাহা হউক, এই পদটী যে বিদ্যাপতিকৃত সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। বঙ্গদেশপ্রচলিত বিদ্যাপতির অনেক পদ সম্বন্ধেই কিন্তু নিঃসন্দেহে এই কথা বলা যায় না।

অবশিষ্ট ভণিতাহীন পদগুলির সম্বন্ধে যাহা কিছু বক্তব্য আছে, তাহা সংক্ষেপে বলিয়া শেষ করিব।

পদকল্পতরুর ৩৮০ সংখ্যক পদটী গোবিন্দদাস-রচিত ৬০৯ সংখ্যক পদের আংশিক পুনরুক্তি। ৪৪৫ সংখ্যক পদটী জ্ঞানদাস-রচিত ৫১২ সংখ্যক পদ বলিয়াই প্রতীত হয়। ৪৯৯ সংখ্যক কবিতাটী পদকল্পলতিকায় অনুরূপ দৃষ্ট হয়। উক্ত দুই গ্রন্থে এই পদে যথাক্রমে বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের ভণিতা আছে। উক্ত দুই গ্রন্থের পাঠের কোন বৈষম্য নাই। ৮৬৫ সংখ্যক পদটী ৮৫৭ সংখ্যক পদের আংশিক পুনরুক্তি।

অজ্ঞাত কবিগণের পদসমষ্টি ২১৬।

পদসংখ্যা যথা—৭৯।১১৬।১২৬।১৪২।১৭৮।১৯১।২২৪।২৪১।২৪৫।২৪৭।২৫৮।২৭২।২৭৪।২৮৯।২৯১।২৯৪।২৯৬।৩৩৭।৩৪৩।৪২৭।৪৪৪।৪৬১।৪৯১।৫১৫।৫১৯।৫৪১।৫৪২।৫৪৬।৫৫৪।৫৫৬।৫৫৯।৫৯০।৬০৭।৬১৪।৬৪৬।৬৭৪।৬৯৮।৭৭৭।৭৮৩।৭৯০।৭৯৪।৮২১।৮৩৬।৮৪৩।৮৪৪।৮৫৩।৮৬১।৯০৪।৯০৫।৯১৮।৯২৯।৯৩৩।৯৫৪।৯৬৬।৯৭০।১০৫৪।১০৬৪।১০৮৬।১১৩০।১১৩১।১১৪৫।১১৪৯।১১৫৪।১১৫৬।১১৫৯।১১৬০।১১৬৩।১১৬৯।১১৭১।১১৭২।১১৭৪।১১৮০।১১৮২।১১৮৩।১১৮৬।১১৯০।১১৯৫।১২০৯।১২১৪।১২২৪।১২৩৪।১২৪৪ ১২৪৫।১২৪৬।১২৭৩।১২৭৫।১২৮২।১২৯১।১২৯৪।১২৯৫।১৩১১।১৩২০।১৩২১।১৩৪০—১৩৪৩।১৩৫৬—১৩৫৮।১৩৬৪।১৩৬৬।১৩৬৭।১৩৭৪।১৩৭৭।১৩৮০।১৩৮১।১৩৯১—১৩৯৩।১৩৯৮—১৪০০।১৪১১।১৪২০।১৪৫৮।১৫২০।১৫৩৪।১৫৩৮।১৫৪৪।১৫৫১।১৫৮২।১৫৮৮।১৬১০।১৬০-৬১।১৭৩০।১৭৩২।১৭৭৭।১৭৯৪।১৮০৬।১৮৬০।১৮৬১।১৮৬৩।১৮৭৬।১৯১৭।১৯২৮।১৯৮৯।২০০৪।২০০৯।২০১৩।২০৩৫।২১১৭।২১৪৭।২১৪৮।২১৫৬।২১৬০।২১৬৬.২১৭৬।২১৯২।২১৯৯।২২০৪।২২২১।২২৩৪।২২৬০।২২৭৪।২২৭৭।২২৮৭।২৩১৬।২৩৬৬।২৩৮০।২৩৯৯।২৪৫৫।২৪৬৫।২৪৯৪।২৫১০।২৫১৩।২৫২৫।২৫৩৪।২৫৬২।২৫৭৯।২৫৮০—২৫৮২।২৫৮৭।২৫৮৮।২৫৯০।২৬৪৬।২৬৮৯।২৭১৯।২৭২৩।২৭-৩৫।২৭৩৮—২৭৪৬।২৭৯২—২৭৯৪।২৮৭৭।২৮৭৮।২৮৮০—২৮৮৩।২৮৮৬—২৮৮৯।২৮৯১।২৮৯৪-২৮৯৬।২৯০২।২৯৪২।২৯৬৫।২৯৭৮।৩০০৭—৩০০৯।৩০১৫।

(২)

অনন্ত।

পদকল্পতরুগ্রন্থে "অনন্তদাস" 'অনন্ত আচার্য্য,' ও 'অনন্তরায়' এই তিন ভণিতায় পদই দৃষ্ট হয়। ইহাদিগের রচিত পদসংখ্যা যথা—

অনন্ত আচার্য্য = ২২১৫ সংখ্যক ১টি পদ।

অনন্তদাসের পদসমষ্টি ৩৮। পদ সংখ্যা যথা—

১২৪।১২৫।১৪৮।২৬৮।২৯৩।২৯৭।২৯৯।৩০৬।৩২৬।৩৪৬।৩৫৪।৪১০ ৫৫৩।৬৪৯।৭ ৭৬।১০২৫।

১০৬৫।১০৬৬।১১৯৮।১১৯৯।১২৬৭।১২৭৬।১৩৩৩।১৪৯৩।১৫০৪।১৭৪৬।১৯১০।১৯৪৯।১৯৫০।১৯৫২।১৯৫৩।২০৯৬।২১৩৮।২২৬৬।২৩৪৯।২৩৫১।২৩৭৮।২৯১৩।

অনন্তরায়ের পদ ২টি। পদসংখ্যা—২২৫৮।২২৬৭। বৈষ্ণব কবিগণ ভণিতায় প্রায়শই দীনতাব্যঞ্জক 'দাস' উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন। গোবিন্দচক্রবর্ত্তী, শ্রীনিবাস আচার্য্য, রাধা-মোহন ঠাকুর প্রভৃতি দ্বিজকুলোদ্ভব পদকর্ত্তৃগণের সকলেরই ভণিতায় দাস উপাধি দেখা যায়। স্বীয় কুলোপাধি এইরূপে গুপ্ত রাখায় অনেক সময়েই তাঁহাদিগের প্রকৃত পরিচয়ে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। পদকর্ত্তা অনন্তের সম্বন্ধেও তাহাই ঘটিয়াছে। আমাদের বোধ হয়—'অনন্তদাস' ও 'অনন্তরায়' একই ব্যক্তি। ইঁহারই অন্য উপাধি "আচার্য্য" কিনা তাহা ঠিক বলা যায় না। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে একজন অনন্ত আচার্য্যের উল্লেখ আছে—

"পণ্ডিত গোসাঞিির শিষ্য অনন্ত আচার্য্য।
কৃষ্ণপ্রেমময় তনু উদার সর্ব্ব আর্য্য ॥
তাঁহার অনন্ত গুণ কে করে প্রকাশ।
তাঁর প্রিয় শিষ্য ইহোঁ পণ্ডিত হরিদাস ॥
* * * *
তিঁহো বড় কৃপা করি আজ্ঞা দিল মোরে।
গৌরাঙ্গের শেষ লীলা বর্ণিবার তরে ॥" ইত্যাদি চৈতন্যচরিতামৃত

আদি লীলা ৮ম পরিচ্ছেদ—

এস্থলে 'পণ্ডিত গোসাঞিি' শব্দের লক্ষ্য মহাপ্রভুর প্রিয় পারিষদ গদাধর পণ্ডিত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ "অদ্বৈতশাখা-বর্ণন" নামক আদিলীলার ১২শ পরিচ্ছেদে গদাধর পণ্ডিতের শাখা গণনায় "অনন্ত আচার্য্যের" উল্লেখ করিয়াছেন—

"শ্রীগদাধর পণ্ডিত উপশাখা মহোত্তম।
তার উপশাখা কে করিবে গণন ॥
* * * *
অনন্ত আচার্য্য কবিদত্ত মিশ্র ও নয়ন।" ইত্যাদি—

গদাধর পণ্ডিত মহাপ্রভুর সমকালীন ব্যক্তি। মহাপ্রভুর তিরোভাব কালে অর্থাৎ ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে বোধহয় গদাধর পণ্ডিত ও অনন্ত আচার্য্য উভয়েই জীবিত ছিলেন।

কৃষ্ণদাস বাবাজী প্রণীত "ভক্তমাল" গ্রন্থে এক অনন্ত আচার্য্যকে শ্রীরাধার সখী সুদেবীর অবতার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে—

"সুদেবী অনন্ত আচার্য্য গৌরাঙ্গ কিঙ্কর ॥" (ভঃ মাঃ)

সম্ভবতঃ চৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণিত অনন্ত আচার্য্য সম্বন্ধেই ইহা বলা হইয়াছে—কারণ পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থগুলিতে একজন ভিন্ন দুইজন "অনন্ত আচার্য্যের" উল্লেখ পাওয়া যায় না।

চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে অদ্বৈতাচার্য্য শাখা গণনায় এক অনন্তদাসের উল্লেখ আছে—

"অনন্তদাস কাণুপণ্ডিত দাস নারায়ণ" (চৈ-চ আদি ১২শ)

এই অনন্তদাসই পদকর্ত্তা অনন্তদাস কিনা নিশ্চিত জানা যায় না।

অনন্তদাসের পদ রাধামোহন ঠাকুরের "পদামৃতসমুদ্রে" উদ্ধৃত হইয়াছে, সুতরাং অনন্ত যিনিই হউন না কেন তিনি যে রাধামোহন ঠাকুরের অপেক্ষা প্রাচীন—অন্ততঃ সমকালীন ব্যক্তি সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রাধামোহন ঠাকুরের "পদামৃত-সমুদ্র" রচনার কাল আনুমানিক খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনীতে ঐ বিষয়ের আলোচনা করিব।

মহাপ্রভুর পারিষদ্‌গণের মধ্যে অনন্তদাসের নাম দেখা যায় না। সম্ভবতঃ ইনি মহাপ্রভুর অব্যবহিত পরবর্ত্তী। সুতরাং আনুমানিক ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দের পরে তিনি প্রাদুর্ভূত হন। ইহাঁর রচিত একটি গৌরাঙ্গের ষড়্‌ভুজরূপ-বর্ণনা আছে (২০৯৬ পদ দ্রষ্টব্য)। অনন্ত সুকবি ছিলেন। তিনি একদিকে চণ্ডীদাসের ন্যায় সরল ভাষায় দুই চারিটি কথায় প্রাণের গভীর সরল উচ্ছ্বাসগুলি ব্যক্ত করিতে পারিতেন। অন্যদিকে গোবিন্দদাসের ন্যায় ভাবপূর্ণ সুললিত পদ-বিন্যাসেও সমর্থ ছিলেন। অনন্তের 'কি হেরিনু কদম্বতলাতে' (৯২ পৃঃ) ও 'সজনি ও কে নাগর তরুমূলে' (১০৯ পৃ) পূর্ব্বরাগের এই সুললিত পদ দুটি প্রথমশ্রেণীর কবির অনুপযুক্ত নহে।

"কিশোর বয়স বেশ
আর তাহে রসাবেশ
　　　আর তাহে ভাতিয়া চাহনি।
হাসির হিলোলে মোর
পরাণ পুতলী দোলে
　　　দিতে চাই যৌবন নিছনি॥" (৯২ পৃঃ)

এইরূপ সরল ও গভীর মর্ম্ম-স্পর্শী উক্তি দ্বারা কবি নায়িকার মনের ব্যাকুলতা বুঝাইয়া দিতেছেন।

"বিকচ সরোজ ভান মুখমণ্ডল" (১৭৯১ পৃঃ)

এই পদটী গোবিন্দ দাসের উৎকৃষ্ট রূপ বর্ণনার পদের সহিত তুলনীয়। এতদ্ব্যতীত

"কানুর লাগিয়া জাগি পোহায়লু" ইত্যাদি (২৩৫৩ পৃঃ

বিপ্রলব্ধাবর্ণনটী অতি মনোহর হইয়াছে। তবে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, বলরাম দাস কি বসন্তরায়ের তুলনায় অনন্তের ঈদৃশ কবিতার সংখ্যা নিতান্তই অল্প। আর একটী কৌতুকের বিষয় এই অনন্তদাসের পূর্ব্বরাগ, ও রূপবর্ণনার পদে যে সুমধুর কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা তাঁহার অন্যবিষয়ক পদে লক্ষিত হয় না। নিম্নশ্রেণীর কবিগণ দ্বারাও যে কদাচিৎ উচ্চ

শ্রেণীর কবিতা রচিত হইতে পারে, ইহা তাহার একটী দৃষ্টান্ত-স্থল। যাহা হউক, অনন্তের পূর্ব্বোক্ত চারিটী পদের জন্যই যে তিনি চিরকাল বঙ্গ সাহিত্যে সমাদৃত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

(৩)

আগবরোয়ালি—২৭৫০ সংখ্যক পদ।

ভণিতা দর্শনে ইঁহাকে (আকবর আলী) মুসলমান বলিয়া জানা যায়। ইঁহার দেশকাল কিছুই জানিবার উপায় নাই। এই একটী মাত্র পদ পাঠ করিয়া ইঁহার কবিত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা অন্যায়—কিন্তু এই একটীমাত্র কবিতাই ইঁহার বৈষ্ণবতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। শ্রীরাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলার মাধুর্য্য যে এক জন মুসলমান কবির অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিমোহিত ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমের ভিখারী করিয়াছিল—এই কবিতাটী তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ এবং ইহাই এই কবিতার বিশেষত্ব।

(৪)

আত্মারাম দাস—পদসমষ্টি ৪।

পদসংখ্যা—৬৩৫।২২২৪।২২৩৫।১৯৫১।

আত্মারাম সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। ইঁহার রচিত পদাবলী "পদামৃত-সমুদ্রে" উদ্ধৃত হয় নাই। সম্ভবতঃ ইনি রাধামোহন ঠাকুরের পরবর্ত্তী। ইঁহার ৪টী পদের মধ্যে ৩টী পদই নিত্যানন্দ-বিষয়ক। ইঁহার রচনায় বিশেষ কোন ভাব-বৈচিত্র্য দেখা যায় না, তবে পদগুলি রচয়িতার ভক্তির পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

এই ভক্তি-ভাবটী বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিগণের সাধারণ সম্পত্তি, তাঁহাদিগের পদাবলীতে আর কিছু থাকুক বা না থাকুক এই ভক্তিভাবটী প্রায় সর্ব্বত্রই বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে।

(৫)

আনন্দ

আনন্দ চাঁদ—২৩৬৭ সংখ্যক পদ।

আনন্দদাস—পদ সমষ্টি ২। পদসংখ্যা—২৭১৩।২৭৯১।

আমাদিগের বিবেচনায় আনন্দচাঁদ ও আনন্দদাস অভিন্ন। আনন্দচাঁদের রচিত শ্রীকৃষ্ণের সুদীর্ঘ রূপ-বর্ণনটী ২৭৯১ সংখ্যক পদের শ্রীরাধার রূপ-বর্ণনার সহিত তুলনা করিলেই ইহা প্রতীত হইবে। আনন্দচাঁদ সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। ইনি যে সুমধুর পদবিন্যাসে পটু ছিলেন—তাঁহার কৃত শ্রীকৃষ্ণের সুদীর্ঘ সর্ব্বাবয়ব রূপ-বর্ণনাই সে বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিবে। ইঁহার এই পদটী গোবিন্দদাস অথবা বলরাম দাসের এই শ্রেণীর রূপ বর্ণনার সহিত সর্ব্বথা তুলিত হইবার যোগ্য।

(৬)

উদ্ধব দাস

পদসমষ্টি — ৯৭। পদ-সংখ্যা—৩২।৩৩।৩৫।৪১৮।৪১৯।৫২৫।৫৬৪।৫৭০।৫৮৬।৫৮৮।৫৮৯।৬৪৪।৮১৯।৮৫১।১০৭২।১০৮৩।১১০১।১১৩২।১১৩৫।১১৩৬।১১৩৯।১১৪০।১১৪২।১১৯৪।১১১৭।১২২৬।১২৩২।১২৫৩।১২৫৪।১২৫৬ ১২৮৫।১৩৪৪।১৩৪৬।১৪৮।১৪৩৩ ১৪৩৪।১৪৪০।১৪৪৩।১৪৫২।১৪৫৪।১৪৬৭।১৪৬৮।১৪৬৯।১৪৭৭।১৪৯৯।১৫৫৭।১৫৬১।১৫৯২।১৭০০।১৭০৬।১৭৪৪।১৭৪৮।১৯৬৬।২০০২।২৫০৫.২৩৮২।২৪২৬।২৫৩৭-২৫৪৬।২৫৪৮।২৫৫৮।২৫৬১।২৫৯১।২৬৭৩।২৮৮৩।২৭৫৭—২৭৬০।২৭৭৬।২৮২৬—২৮৩১।৩০১৪।

উদ্ধবদাস অনেকগুলি পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। দুঃখের বিষয় ইহাঁর সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু জানা যায় না।* ৩০১৪ সংখ্যক পদে ইনি পূর্ব্ববর্ত্তী বৈষ্ণব আচার্য্যগণের বর্ণনা করিয়াছেন—তাহাতে লিখিত হইয়াছে—

"শ্রীঠাকুর মহাশয়,　　তাঁর যত শাখা হয়,
　মুখ্য কিছু করিয়ে প্রকাশ।
রামকৃষ্ণ আচার্য্য খ্যাতি,　গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী,
　ভক্তিমূর্ত্তি গামিলা নিবাস।
রূপ রাধু রায় নাম,　　গোকুল শ্রীভগবান,
　ভক্তিমান শ্রীউদ্ধব দাস॥"

সর্ব্বশেষে এইরূপ ভণিতা আছে—

"শ্রীরাধামোহন পদ,　　যার ধন সম্পদ,
　নাম পায় এ উদ্ধবদাস॥"

ইহা দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে যে উদ্ধব দাস সুবিখ্যাত বৈষ্ণবাচার্য্য নরোত্তম ঠাকুরের শাখাভুক্ত এবং এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে তিনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের পৌত্র রাধামোহন ঠাকুরের মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন। কিন্তু এইরূপ হইলে রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃত-সমুদ্রে যে ইহাঁর বহু-সংখ্যক পদাবলী হইতে ২।৪টী পদও উদ্ধৃত হন নাই, ইহা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এই বিরোধ পরিহার জন্য দ্বিতীয় উদ্ধব দাসের অস্তিত্ব অথবা উদ্ধব দাসের পদ রচনার পূর্ব্বেই "পদামৃতসমুদ্রের" সংগ্রহ ও সমাপ্তির কল্পনা করা যাইতে পারে। আমাদিগের কিন্তু সন্দেহ হয় যে পদ বর্ণিত "ভক্তিমান উদ্ধবদাস" ও এই পদকর্ত্তা উদ্ধব এক ব্যক্তি নহেন।

---

* শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবুর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থে লিখিত আছে, উদ্ধবদাস—অপর নাম কৃষ্ণকান্ত; ইনি পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণবদাসের বন্ধু ছিলেন। বাড়ী টেঞা (বৈদ্যপুর), দুঃখের বিষয় দীনেশ বাবু তাঁহার এই উক্তির পোষক কোন প্রমাণের উল্লেখ করেন নাই।

বিনয়ের আদর্শ প্রাচীন বৈষ্ণব কবির পক্ষে নিজকে "ভক্তিমান" বলিয়া পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর বোধ হয় না। ভণিতার অর্থ দ্বারাও এরূপ নিশ্চিত বুঝায় না যে পদকর্ত্তা রাধামোহনের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। পরবর্ত্তী কবির পক্ষেও ভক্তিবশতঃ এইরূপ উক্তি অসম্ভব নহে। সুতরাং আমাদিগের বিবেচনায় পদামৃত-সমুদ্রকার রাধামোহন ঠাকুরের পরবর্ত্তী সময়ে উদ্ধব দাস আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় নরোত্তম ঠাকুরের শাখাভুক্ত ভক্তিমান উদ্ধবদাস কোন পদ রচনা করিয়া থাকিলে তাহা অপর উদ্ধবদাসের পদ হইতে পৃথক্ করা একরূপ অসম্ভব। এই পদ দর্শনে বোধ হয় যে "ভক্তিমান্" উদ্ধব নরোত্তম ঠাকুর ও সম-সাময়িক শ্রীনিবাস আচার্য্যের সমকালীন অথবা কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী ছিলেন। এরূপ অবস্থায় তিনি পদ রচনা করিয়া থাকিলে রাধামোহন ঠাকুরের সংগ্রহে অবশ্যই তাহা স্থান পাইত। সুতরাং বিবেচনা হয় যে এই উদ্ধব তাঁহার ভক্তিময় জীবনের জন্য যেরূপ বিখ্যাত ছিলেন পদকর্ত্তা বলিয়া সেইরূপ ছিলেন না। পক্ষান্তরে পদকর্ত্তা উদ্ধব দাস যে সুকবি ছিলেন সে সম্বন্ধে মতভেদ নাই। উদ্ধবদাসের পদাবলীর কবিত্ব সম্বন্ধে কোন কথা বলার পূর্ব্বে ইহাও বলা উচিত যে তাঁহার নামীয় পদগুলি প্রণিধান সহকারে পাঠ করিলে তাহা একব্যক্তির রচনা বলিয়াই প্রতীতি হয়।

উদ্ধবদাস—পূর্ব্বরাগ, মান, আক্ষেপানুরাগ, বাল্যলীলা, গোষ্ঠ, রাসলীলা, দানলীলা, হোরি, ঝুলন, মাথুর, বিরহ, রূপবর্ণন প্রভৃতি নানাবিষয়ের পদ রচনা করিয়াছেন। কবিত্ব বিষয়ে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পালা ছাড়িয়া দিয়া গোবিন্দদাস, বলরামদাস, রায়শেখর, বসন্তরায় প্রভৃতি কবিগণের পরেই ইহাঁর স্থান নির্দ্দেশ করিতে হয়। উদ্ধবদাস, বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ও ব্রজবুলি মিশ্রিত দুইরকম পদই রচনা করিয়াছেন। ইহাঁর রচিত প্রাঞ্জল ও সুললিত লঘুত্রিপদী ছন্দের "কদম্বের বনে থাকে কোন জনে" (২৯ পৃঃ) ইত্যাদি পদগুলি ইহাঁর ভাষার বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিবে। প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণ যে অনেক সময়ে প্রচলিত ভাষা পরিত্যাগ করিয়া ব্রজবুলিতে পদ রচনা করিয়াছেন—উদ্ধবের ব্রজবুলির পদ পাঠে তাহাও প্রতীত হইবে। পাঠকগণ ৩২—৩৫ প্রভৃতি পদে উদ্ধবের সুললিত অবিমিশ্র রচনা, ৪১৮।৪১৯ প্রভৃতি পদে উত্তম ব্রজবুলি—"দেখ সখি ঝুলত রাধাশ্যাম" (১৫-৫১ পদ) ও "নব গোরোচন জিনিয়া বরণ" (১৭৪০ পৃঃ) ইত্যাদি পদে তাঁহার রচনা ও কবিত্বশক্তির পরিচয় লইবেন। নানাবিষয়ক রচনায় অতি অল্পসংখ্যক কবিই দক্ষতা দেখাইতে পারেন ; এরূপ অবস্থায় উদ্ধবের নানা বিষয়িণী পদাবলী পাঠ করিয়া তাঁহার কবিত্বের প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। প্রাচীন মহাজনদিগের বর্ণনা সম্বলিত উদ্ধবের ২৩০৩—২৩০৫ ও ৩০১৪ সংখ্যক পদগুলি ঐতিহাসিকের নিকট অনাদৃত হইবে না। আমাদের এই ইতিহাসহীন দেশে অনেকস্থলেই এইরূপ বিক্ষিপ্ত বিবরণসমূহের সংগ্রহ ব্যতীত প্রাচীন মহাজনগণের সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য ধারাবাহিক বৃত্তান্ত জানিবার সম্ভাবনা অল্পই আছে।

(৭)

কবিরঞ্জন।

পদসমষ্টি—৭। পদসংখ্যা—২১২।২৫৬,৬৭৯।৯৬১।১০৭৫।১১০০।১৭৫৭।

কবিরঞ্জন যে কোন ব্যক্তির উপাধি নাম নহে, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। পদকল্পতরু গ্রন্থের অষ্টাবিংশ পল্লবে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের যে মিলন বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি দৃষ্ট হয়, যথা—

"চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে মিলল
বটতলে সুরধুনী তীর ॥"
"পুছত চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে
শুনতহি রূপনারায়ণ ॥
কহ বিদ্যাপতি ইহ রস কারণ
লছিমা পদ করি ধ্যান ॥"

ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে এই পদের রচয়িতা বিদ্যাপতি ও কবিরঞ্জনকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া জানিতেন।

কবিরঞ্জনের ভণিতাযুক্ত পদগুলি বিদ্যাপতির পদের সহিত তুলনা করিলে তাহা এক ব্যক্তির রচিত বলিয়াই বোধ হয়।

"কি পুছসি রে সখি কানুক লেহ।" (৬৭৯ পদ)

এই সুবিখ্যাত পদটি পদকল্পতরু ও পদামৃতসমুদ্রে কবিরঞ্জনের নামে এবং পদকল্পলতিকায় কবিশেখরের নামে উদ্ধৃত হইয়াছে। কবিরঞ্জনের অন্যান্য পদগুলিও বিদ্যাপতির উৎকৃষ্ট পদের সহিত তুলিত হইবার অযোগ্য নহে।

(৮)

কানুরাম।

পদসমষ্টি—১২। পদসংখ্যা, ৩১১।৩৩২।৩৩৪।৬৬১।১৯৬৫।১৯৭৭।১৯৭৮।২০৪৬।২১৭৩।২১৮৪।২২৫১।২২৫৭। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে নিত্যানন্দের শাখা গণনায় কানুঠাকুরের উল্লেখ আছে যথা,—

"শ্রীসদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয়।
শ্রীপুরুষোত্তম দাস তাঁহার তনয় ॥
আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে।
নিরন্তর বাল্যলীলা করে কৃষ্ণসনে ॥
তার পুত্র মহাশয় শ্রীকানুঠাকুর।
যার দেহে রহে কৃষ্ণ প্রেমামৃত পূর ॥" (চৈ-চ আদি ১১শ)

সম্ভবতঃ এই কানুঠাকুরই পদকর্ত্তা কানুরাম হইবেন। ইনি নিত্যানন্দের সহচর পুরুষোত্তমদাসের পুত্র। উক্ত গ্রন্থে অদ্বৈতাচার্য্যের শাখা গণনায় আর এক কানুপণ্ডিতের উল্লেখ আছে যথা,—

"অনন্তদাস কানুপণ্ডিত দাস নারায়ণ।" (চৈ-চ-আদি ১২শ)

উক্ত কানুঠাকুর ও পণ্ডিত কানু একই ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়।

কানুরাম বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ও ব্রজবুলি দুইরকম পদই রচনা করিয়াছেন। ৩১১।৩৩৪।১৯৭৭। ১৯৭৮ প্রভৃতি পদে ইহার বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল রচনা এবং ৩৩২।৬৬১। প্রভৃতি পদে ইহাঁর ব্রজবুলি রচনার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাঁর রচিত বাঙ্গালা পদগুলি কবিত্বাংশে মন্দ নহে। ইনি সরল ভাষায় কথা ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

(৯)

কৃষ্ণকান্ত।

পদসমষ্টি ২৯। পদসংখ্যা ২৭৯৫—২৮২৩। কৃষ্ণকান্তের জীবনী সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। তাঁহার রচিত পদগুলি দ্বাত্রিংশৎ পল্লবের শেষভাগে একত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইনি সুললিত ব্রজবুলির পদ রচনায় পটু ছিলেন,—ইহাঁর অধিকাংশ পদই ব্রজবুলি মিশ্রিত। বহিঃপ্রকৃতির মনোহারিত্ব ইহাঁর রচনায় স্থানে স্থানে বেশ ফুটিয়াছে। দৃষ্টান্তস্থলে "সহজেই ভূধর পরম মনোহর" (২৮১০) প্রভৃতি পদের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভাবের গভীরতা ইহাঁর রচনায় বিরল।

(১০)

কৃষ্ণদাস।

কৃষ্ণদাস—পদসমষ্টি ২৩। পদসংখ্যা ১০৮২।১১১২।১১১৩।১২০৭।১২৩৮।১৪৬০।১৫৬৬। ১৫৭২।১৭৪০।১৯৪৮।২০১৯।২২৭৩।২২৮৮—২২৯০।২৭৬৬।২৭৭৮—২৭৮০।২৯০৯।২৯১০।২৯২৪। ৩০০৬।

কৃষ্ণদাস (কবিরাজ)— পদসমষ্টি ৫। পদসংখ্যা ১১১৮।১৫৪১।১৬৩০।১৬৪৯।২৯৫৯।

কৃষ্ণভক্তদিগের নিকট কৃষ্ণদাস নামটি বড়ই প্রিয়; তাই চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্য-ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে অনেকগুলি কৃষ্ণদাসের উল্লেখ পাওয়া যায় যথা ;—

১ম—দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে মহাপ্রভুর সহচর কুলীন ব্রাহ্মণ "কৃষ্ণদাস"

"কৃষ্ণদাস নাম শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ।
যারে সঙ্গে লৈয়া কৈল দক্ষিণগমন॥" (চৈ-চ আদি ১০ পরিচ্ছেদ)

ইনি অতি সরল-স্বভাব ছিলেন। মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ সময়ে ভট্টমারীগণ ইহাঁকে প্রলুব্ধ করিয়া লইয়া যায় (চৈ-চ-মধ্য ৯ম)। ভট্টমারীগণের নিকট হইতে ইহাঁকে উদ্ধার করিয়া নানাদেশ পর্য্যাটনান্তে মহাপ্রভু নীলাচলে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ইহাঁকে যথা ইচ্ছা যাইবার আদেশ করেন। কিন্তু যখন কৃষ্ণদাস প্রভুর সঙ্গ ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া রোদন

করিতে লাগিলেন, তখন অগত্যা মহাপ্রভু নিত্যানন্দ জগদানন্দ প্রভৃতির অনুরোধে ইহাঁর দ্বারা গৌড়ে অদ্বৈতাচার্য্যাদির নিকট সম্বাদ দিয়া পাঠান (চৈ-চ-মধ্য ১০ম)। ইহার পরে এই কৃষ্ণদাসের আর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ স্বদেশে গৌরাঙ্গভক্তিতে ইহাঁর অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত হইয়া থাকিবে।

২য়—নিত্যানন্দের শ্বশুর সূর্য্যদাস সরখেলের ভ্রাতা কৃষ্ণদাস।

"সূর্য্যদাস সরখেল তাঁর ভাই কৃষ্ণদাস।
নিত্যানন্দে দৃঢ় বিশ্বাস প্রেমের নিবাস॥" (চৈ-চ-আদি ১১শ)

ইহাঁর সম্বন্ধে অধিক কিছু জানা যায় না।

৩য়—অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস।

"অকিঞ্চন প্রভুর প্রিয় কৃষ্ণদাস নাম।" (চৈ-চ আদি ১০ম)
"অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস চলিলা শ্রীধর।" (চৈ-ভা শেষ ৭ম)

৪র্থ—কৃষ্ণদাস (বৈদ্য)

"কৃষ্ণদাস বৈদ্য আর পণ্ডিত শেখর।" (চৈ-চ ঐ)

৫ম—রাঢ়দেশবাসী কালিয়া কৃষ্ণদাস ;—

"রাঢ়দেশে জন্ম কৃষ্ণদাস দ্বিজবর।
শ্রীনিত্যানন্দের তিহোঁ পরম কিঙ্কর॥
কালা কৃষ্ণদাস বড় বৈষ্ণব প্রধান।
নিত্যানন্দ চন্দ্র বিনা কিছু নাহি জান॥" (চৈ-চ আদি ১১শ)
"রাঢে জন্ম মহাশয় দ্বিজ কৃষ্ণদাস।
নিত্যানন্দ পারিষদ যাঁহার বিলাস॥
প্রসিদ্ধ কালিয়া কৃষ্ণ নাম ত্রিভুবনে।
গৌরচন্দ্র লভ্য হয় যাহার স্মরণে॥" (চৈ-ভা শেষ ৫ম)

মহাপ্রভুর আজ্ঞায় নীলাচল হইতে নিত্যানন্দের ভক্তি প্রচারার্থ গৌড়দেশে গমনপ্রসঙ্গে চৈতন্য-ভাগবতে যে কৃষ্ণদাস পণ্ডিতের কথা লেখা আছে বোধ হয় সেই কৃষ্ণদাস পণ্ডিত ও কালিয়া কৃষ্ণদাস অভিন্ন ব্যক্তি। এই কৃষ্ণদাস নিত্যানন্দের ভক্তগণ মধ্যে অতি প্রধান ছিলেন, সময়ে সময়ে ইহাঁর ব্রজগোপালের ভাবাবেশ হইত—

"কৃষ্ণদাস পরমেশ্বর দাস দুইজন।
গোপাল ভাবে হৈ হৈ করে অনুক্ষণ॥" (চৈ-ভা শেষ ৫ম)

৬ষ্ঠ। নারায়ণ, মনোহর ও দেবানন্দের ভ্রাতা কৃষ্ণদাস। এই নারায়ণ সম্বন্ধেই সম্ভবতঃ বলা হইয়াছে—

"নারায়ণ পণ্ডিতশাখা এ বড় উদার।" (চ-চ আদি ১০ম)

এই কৃষ্ণদাস সম্বন্ধে অধিক কিছু জানা যায় না; নিত্যানন্দপ্রভুর পারিষদগণের নাম

প্রসঙ্গে এই চারিভ্রাতার উল্লেখ পাওয়া যায়। চৈতন্যভাগবতেও একত্র কৃষ্ণদাস ও দেবানন্দের উল্লেখ আছে—

"কৃষ্ণদাস দেবানন্দ দুই শুদ্ধমতি।" (চৈ-ভা শেষ ৫ম)

৭ম। বড়গাছী নিবাসী কৃষ্ণদাস।

"বড়গাছী নিবাসী সুকৃতি কৃষ্ণদাস।
যাহার গ্রামেতে নিত্যানন্দের বিলাস॥" (ঐ)

৮ম। কৃষ্ণদাস—অদ্বৈত আচার্য্যের শাখাভুক্ত ছিলেন। (চৈ-চ আদি ১২শ)

৯ম। উড়িষ্যাদেশীয় জগন্নাথদেবের সুবর্ণ বেত্রবাহক কৃষ্ণদাস।

"কৃষ্ণদাস নাম এই সুবর্ণবেত্রধারী।" (চৈ-চ মধ্য ১১শ)

১০ম। দুখী ওরফে শ্যামানন্দ ওরফে কৃষ্ণদাস। ঘনশ্যাম ওরফে নরহরি চক্রবর্ত্তীর চিত ভক্তি-রত্নাকর গ্রন্থে এই কৃষ্ণদাসের বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। এই কৃষ্ণদাস দণ্ডেশ্বর গ্রামবাসী এক সদ্গোপের পুত্র। বাল্যকালে সকলে ইঁহাকে দুখী বলিয়া ডাকিত। ইঁহার দীক্ষাগুরুর নাম হৃদয়চৈতন্য। বৃন্দাবনবাসকালে দুখী কৃষ্ণদাস শ্যামানন্দ নামে পরিচিত হন। ইঁহার শেষজীবন উড়িষ্যায় বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারে অতিবাহিত হয়। ইনি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জীবিত ছিলেন।

১১শ। চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থের প্রণেতা সুবিখ্যাত কৃষ্ণদাস কবিরাজ। ১৪৯৬ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলার ঝামটপুর গ্রামে বৈদ্যবংশে ইঁহার জন্ম হয়। কৃষ্ণদাস দারপরিগ্রহ করেন নাই। নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশে ইনি বৃন্দাবনে প্রস্থান করেন এবং তথায় রূপ, সনাতন, জীব, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট ও গোপালভট্ট এই সুপ্রসিদ্ধ ষট্‌গোস্বামীর নিকট ভক্তিশাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ পাণ্ডিত্য-খ্যাতি লাভ করেন। ইনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা বিষয়ক "গোবিন্দলীলামৃত" গ্রন্থ ও বিল্বমঙ্গল ঠাকুর কৃত "কৃষ্ণকর্ণামৃতের" টীকা রচনা করিয়া ৭৬ বৎসর বয়সে "চৈতন্যচরিতামৃত" রচনায় প্রবৃত্ত হন। এই গ্রন্থ-রচনা বিষয়ে মুরারিগুপ্ত ও স্বরূপদামোদরের কড়চা, রঘুনাথ দাস গোস্বামী মহাশয়ের নিকট শ্রুত ও তাঁহার সাক্ষাৎ দৃষ্ট মহাপ্রভুর বিবরণ এবং বৃন্দাবনদাসের "চৈতন্যভাগবত"ই তাঁহার মূল অবলম্বন ছিল। এতদ্ভিন্ন মহাপ্রভুর ভক্ত শিবানন্দসেনের পুত্র কবিকর্ণপূরের রচিত "চৈতন্যচন্দ্রোদয়" নামক সংস্কৃত নাটক ও রূপগোস্বামীর কড়চা হইতেও তিনি সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতের রচনা নয়বৎসরে সমাপ্ত হইয়াছিল।

উপরে যে ১১ জন কৃষ্ণদাসের নাম লিখিত হইল এতদ্ব্যতীত তাঁহাদিগেরই প্রায় সমসাময়িক আরও ২।৪ জন প্রসিদ্ধ কৃষ্ণদাসের বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। তাঁহারা সকলেই উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোক। কৃষ্ণদাস বাবাজির রচিত "ভক্তমাল" গ্রন্থে ইঁহাদিগের ২।১ জনের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে বিখ্যাত বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের আদি গুরু মহাপ্রভুর সমসাময়িক বল্লভাচার্য্যের শিষ্য কৃষ্ণদাস পয়আহারীই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ইনি ব্রজভাষায়

কৃষ্ণলীলাবিষয়ক বহুসংখ্যক পদ রচনা করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে কৃষ্ণলীলাত্মক পদ রচনাবিষয়ে তিনি উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের অদ্বিতীয় কবি সুরদাসের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। আগর-দাস ইহাঁর অন্যতম প্রধান শিষ্য ছিলেন। আগরদাসের শিষ্য নাভাজি ব্রজভাষায় দোহা ছন্দে "ভক্তমাল" গ্রন্থ রচনা করেন *। এই কৃষ্ণদাস বা তন্নামধারী অপর মহাত্মগণ যে বাঙ্গালাভাষায় অথবা তথাকথিত ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করিয়াছেন ইহা সম্ভবপর নহে; সুতরাং ইহাদিগের কথা ছাড়িয়া দিলে আমরা বৈষ্ণবগ্রন্থে প্রধানতঃ ১১ জন কৃষ্ণদাসের উল্লেখ পাই। এরূপ অবস্থায় "কৃষ্ণদাসের" ভণিতাযুক্ত পদগুলি যে কোন্‌টি কাহার রচিত তাহার মীমাংসা করা একরূপ অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে।

ভণিতায় কেবল "কৃষ্ণদাস" নাম পাওয়া গেলেও আমরা এই পদাবলির মধ্যে ৫টি পদ কৃষ্ণদাস কবিরাজের নামে চিহ্নিত করিয়াছি। এইরূপ করার কারণ এই যে এই পদগুলি "চৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থে অবিকল দৃষ্ট হয়। রচনা বা বিষয় দৃষ্টে এই পদগুলি যে উক্ত গ্রন্থে গ্রন্থান্তর হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে এরূপ সন্দেহ হইতে পারে না। এমন কি দুই তিনটি পদের পূর্ব্বে "পদকল্পতরু" গ্রন্থে "তথাহি চৈতন্যচরিতামৃতে" এইরূপ পদকর্ত্তার নির্দ্দেশ আছে। অবশিষ্ট পদাবলীর মধ্যে কয়েকটির ভণিতায় "কৃষ্ণদাস" নামের পূর্ব্বে 'দুঃখী' এই বিশেষণটি সংযুক্ত দেখা যায় (১১১২, ১১১৩ ও ১৯৪৮ পদ), এইরূপ বিশেষণ দর্শনে কেহ কেহ এই পদগুলিকে নিঃসন্দেহে দুঃখী কৃষ্ণদাস ওরফে শ্যামানন্দের রচিত বলিয়া স্থির করিতে চাহেন, কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় তাহা সঙ্গত বোধ হয় না। প্রথমতঃ—বৈষ্ণব কবিগণ ভণিতায় নিজ নিজ নামের পূর্ব্বে যে অনেক স্থলেই দীনতাব্যঞ্জক অনেক বিশেষণ সংযুক্ত করিয়াছেন তাহার শত শত দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। কৃষ্ণদাসের ভণিতাযুক্ত পদেও অনেক স্থলে "দীন" (১০৮২, ১৪৬০, ২০১৯ ও ২২৮৮ পদ দ্রষ্টব্য) ও কোন কোন স্থলে "দীন হীন" (২২৮৯, ২২৯০ পদ দ্রষ্টব্য) বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। আমাদিগের বোধ হয়, "দুঃখী" শব্দটিও ঐরূপ অর্থেই প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে। নতুবা কষ্টকল্পনায় "দীন" ও "দীনহীন" শব্দের "দুঃখী" অর্থ ধরিয়া ঐ পদগুলি সমস্তই দুঃখী কৃষ্ণদাসের রচিত বলিয়া স্থির করা যায় না কি ? পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে দীক্ষান্তে দুঃখী কৃষ্ণদাস "শ্যামানন্দ" নামে বৈষ্ণব-জগতে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। শ্যামানন্দের ভণিতাযুক্ত কয়েকটি পদও পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা একাধিক পদকর্ত্তা শ্যামানন্দের বিষয় অবগত নহি। এক ব্যক্তির দুই নামে পদ রচনা করাও সম্ভব বোধ হয় না।

আমাদিগের বর্ণিত কৃষ্ণদাসগণের মধ্যে এক উড়িষ্যাবাসী কৃষ্ণদাসকে ছাড়িয়া দিলে অবশিষ্ট সকলেরই পদরচনার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং এরূপ অবস্থায় বিশেষ প্রমাণের অভাবে আমরা কাহারও সম্বন্ধে পক্ষপাত করিতে প্রস্তুত নহি। এই পদগুলির অধি-

---

* গ্রিয়ার্সন সাহেব কৃত The Modern Vernacular Literature of Hindusthan নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের ২১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

কাংশই গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দের বর্ণনা এবং গৌরাঙ্গ ও কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক। তন্মধ্যে ১৫৭২ সংখ্যক পদে অম্বিকানগরবাসী গৌরীদাস পণ্ডিতের গৃহে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের অভিষেক বর্ণিত হইয়াছে। তদ্রূপ ২২৮৮-২২৯০ পদে উক্ত গৌরীদাসের স্বপ্ন ও তাঁহার গৃহে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের অধিষ্ঠান বর্ণিত হইয়াছে। এই পদগুলির ঐতিহাসিক মূল্য সামান্য নহে। এই সকল পদের রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ হইলে তাহা অন্ততঃ সূত্ররূপেও তাঁহার গ্রন্থে স্থান না পাওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় বটে। পরিশেষে সত্যের অনু-রোধে ইহাও ব্যক্তব্য যে অবশিষ্ট পদাবলীর মধ্যে কয়েকটীর রচনা-প্রণালীর সহিত কৃষ্ণদাস কবিরাজের পদাবলীর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। ২২৭৩ সংখ্যক পদটি কৃষ্ণদাস কবিরাজের নিঃসন্দিগ্ধ পদগুলির সহিত তুলনা করিলেই ইহা প্রতীত হইবে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। গৌরাঙ্গ-ভক্ত বৈষ্ণব-জগতে ভক্তিশাস্ত্রে অসামান্য পাণ্ডিত্যের জন্য যে সকল মহাত্মা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহাদিগের মধ্যে একজন। এ বিষয়ে তাঁহাকে রূপ, সনাতন, জীব গোস্বামী ও রামানন্দ রায়ের সমকক্ষ বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। তাঁহার "চৈতন্য-চরিতামৃত" বঙ্গীয় বৈষ্ণব-জগতে দ্বিতীয় ভাগবতরূপে পূজিত হইতেছে। বস্তুতঃ তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য, উদারতা, অপূর্ব্ব সত্যনিষ্ঠা, সহৃদয়তা, ও ভগবদ্ভক্তির প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না; এই সকল গুণে তাঁহার "চৈতন্য-চরিতামৃত" চৈতন্য-ভাগবতাদির পরবর্ত্তী হইলেও মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্ম ও তাঁহার জীবনচরিত সম্বন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দর্শন ও ইতিহাসের স্থান অধিকার করিয়াছে। কবি-রাজ গোস্বামীর পদাবলীই আমাদের আলোচ্য বিষয়। তাঁহার দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি ও পাণ্ডিত্য যেরূপ প্রশংসাযোগ্য কবিত্ব সেইরূপ নহে। পদাবলীর কবিত্ব উপলক্ষ করিয়াই এই কথা বলিতেছি—নতুবা ঘটনাবলীর বর্ণনায় তিনি যে অপূর্ব্ব ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, বৈষ্ণব সাহিত্যে তাহার তুলনা স্থল অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। তাঁহার বর্ণিত মহাপ্রভুর অমৃতায়-মান চরিত্রের আস্বাদনে অতি পাষণ্ডের হৃদয়ও বিগলিত না হইয়া পারে না। গোস্বামীর রচিত সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর পদাবলী কালে বিলুপ্ত হইতে পারে—কিন্তু তাঁহার "চৈতন্য-চরিতামৃত" তাঁহাকে চিরকালের জন্য অমর করিয়া রাখিবে।

(১১)

কৃষ্ণদাস।

পদসমষ্টি ২। পদসংখ্যা ২৫৩৯৩১। পদামৃত-সমুদ্রকার রাধামোহন ঠাকুরের গ্রন্থের প্রারম্ভে নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটি দৃষ্ট হয়, যথা—

"বন্দে তং জগদানন্দং গুরুং চৈতন্যদায়কং।
গীতবেদার্থবিস্তারে প্রবৃত্তো যৎ কৃপাশয়া॥

গুরোঃ প্রকাশকং শ্রীলকৃষ্ণাখ্যং সর্ব্বসিদ্ধিদং।
প্রসাদপদসংযুক্তং বন্দেঽহং করুণার্ণবম্ ॥"

এই শ্লোক ও রাধামোহন ঠাকুরের স্বকৃত টীকা পাঠে জানা যায়, কৃষ্ণপ্রসাদ রাধামোহনের গুরু জগদানন্দ ঠাকুরের পিতা ছিলেন। এই জগদানন্দ মহাপ্রভুর অসামান্ত প্রেমপাত্র ও সহচর জগদানন্দ পণ্ডিতের অনেক পরবর্ত্তী। রাধামোহন ঠাকুরের পিতামহ শ্রীনিবাস আচার্য্য মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী ছিলেন—এরূপ অবস্থায় রাধামোহন ঠাকুরের সমসাময়িক জগদানন্দ যে মহাপ্রভুর অনেক পরবর্ত্তী হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

রাধামোহন ঠাকুরের জন্মকালের আনুমানিক অন্যূন বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে অথবা শ্রীনিবাস আচার্য্যের জন্মের বিংশতি বৎসর পরে এই কৃষ্ণপ্রসাদের কাল স্থির করা যাইতে পারে। পদামৃত-সমুদ্রের এই একটি উক্তি ব্যতীত ইহাঁর জীবন-বৃত্তান্ত কিছুই জানা যায় না।

কৃষ্ণপ্রসাদের দুইটি মাত্র পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু এই দুইটি মাত্র পদেই তাঁহার কবিত্বের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের আদর্শে পদ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার পদ দুটি সরল ও স্বাভাবিক বর্ণনা কৌশলে উক্ত সুপ্রসিদ্ধ কবিগণের শিষ্যের অনুপযুক্ত হয় নাই।

(১২)

গতিগোবিন্দ

২২৪৮ সংখ্যক পদ।

উক্ত পদের ভণিতা এইরূপ যথা,—

"মনের আনন্দে, শ্রীনিবাসসুত,
গতিগোবিন্দ চিত ভোরয়ে ॥"

রাধামোহন ঠাকুরের কৃত পদামৃত-সমুদ্রের টীকায় লিখিত হইয়াছে—

"শ্রীমদাচার্য্যপ্রভোঃ পুত্রং শ্রীগোবিন্দগতিসংজ্ঞকং।"

ইহা দ্বারা জানা যায় যে শ্রীনিবাস আচার্য্যের এক পুত্রের নাম গতিগোবিন্দ ছিল। এই নাম অপর কোন ব্যক্তির ছিল বলিয়া জানা যায় নাই; সুতরাং ইনিই যে পদকর্ত্তা গতিগোবিন্দ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্রীনিবাস আচার্য্য ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে খেতুরীর মহোৎসবে উপস্থিত হইয়াছিলেন; তখন তাঁহার প্রৌঢ় বয়স। সুতরাং গতিগোবিন্দ ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করিয়া সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জীবিত ছিলেন এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। সম্ভবতঃ তিনি পদকর্ত্তা বলিয়া খ্যাত ছিলেন। পদামৃতসমুদ্রে ইহার রচিত কোন পদ দৃষ্ট হয় না। তবে তিনি গোবিন্দদাস নামে পরিচয় দিয়া কোন পদ রচনা করিয়া থাকিলে তাহা সুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দদাস কবিরাজের সহিত মিশিয়া যাওয়া অসম্ভব নহে।

কিন্তু তিনি যে "গতিগোবিন্দ" ও "গোবিন্দদাস" এই উভয় নামেই পদ রচনা করিয়াছেন তাহার কোন প্রমাণ নাই।

(১৩)

গুপ্তদাস

পদ সমষ্টি ১। পদ-সংখ্যা ১৬৯৭।২২৪৮।

"গুপ্তদাস" শব্দটি যে উপাধিসূচক তাহা সহজেই প্রতীত হয়। 'গুপ্ত' উপাধিধারী পদ-কর্ত্তৃগণ মধ্যে মুরারিগুপ্ত সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। 'মুরারিগুপ্ত' ভণিতার দুইটি পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই মুরারিগুপ্ত নিজকে "গুপ্তদাস" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন কি না বলা যায় না। বৈদ্যবংশীয় ব্যক্তিগণ সকলেই "দাসগুপ্ত" বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এরূপ অবস্থায়, অপর কোন বৈদ্যকুলোদ্ভব ব্যক্তির পক্ষেও এইরূপ পরিচয় দান অসম্ভব নহে। শিবানন্দ, বল্লভ প্রভৃতি বৈদ্যবংশীয় অনেক পদকর্ত্তার পদ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইয়াছে। গুপ্তদাসের পদ দুইটিতে কোন বিশেষত্ব নাই।

(১৪)

গোকুল।

পদসংখ্যা—২৮৯৩। গোকুলানন্দ। পদসংখ্যা—২২৮১।

গোকুলদাস ও গোকুলানন্দের নামে দুইটি মাত্র পদ আছে; গোকুল গোকুলানন্দেরই সংক্ষেপ কি না নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। চৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থে নিত্যানন্দের শাখা-বর্ণনায় এক গোকুলদাসের নাম উল্লিখিত হইয়াছে—

"শ্রীমন্ত গোকুলদাস হরিহরানন্দ।" (চৈ-চ আদি ১১শ)

ইঁহার সম্বন্ধে আর অধিক কিছু জানা যায় না। ইনি মহাপ্রভুর সমসাময়িক এবং নিত্যানন্দপ্রভুর একজন পারিষদ ছিলেন।

এতদ্ভিন্ন নরহরি চক্রবর্ত্তীর "ভক্তিরত্নাকরে" একজন কীর্ত্তনিয়া গোকুলদাসের উল্লেখ আছে। নিত্যানন্দপ্রভুর পুত্র বীরভদ্র গোস্বামী খেতুরীর মহোৎসবে ইঁহার মুখে গোবিন্দ-দাসের পদাবলীর গান শ্রবণে মোহিত হইয়া—

"শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের দুটি কর ধরি।
কহে তুয়া কাব্যের বালাই লৈয়া মরি॥" (ভ-র)

গোকুলদাসের রচিত কৃষ্ণের স্তোত্রে (২৮৯৩ পদ) অনুপ্রাসের আধিক্য দৃষ্ট হয়, বোধ হয় এইরূপ পদই পরবর্ত্তী সময়ে গোবিন্দ কবিরাজের অপূর্ব্ব অনুপ্রাসময় পদগুলির আদর্শ হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে নলোদয়কার কালিদাসের নিকট ঘটকর্পরের ন্যায়, কবিরাজ গোবিন্দদাসের নিকট অনুপ্রাসপথের পথিক পদকর্ত্তৃগণ সকলেই সম্পূর্ণ পরাভূত হইয়াছেন।

(১৫)

গোপাল।

পদসংখ্যা ১৮০। গোপালদাস—পদসমষ্টি ৪। পদসংখ্যা ৩৯৪।১২৫৫।২৮৮৪।২৯৭২।
গোপালভট্ট—পদসংখ্যা ২৭৫২।

চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে বৃন্দাবনবাসী সুপ্রসিদ্ধ গোস্বামী গোপালভট্ট ও তদ্ভিন্ন আরও কয়েকজন গোপালের উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ। গোপালভট্ট। ইনি সুপ্রসিদ্ধ ছয় জন আদি গোস্বামীর মধ্যে একজন। ইনি চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজের অন্যতম শিক্ষাগুরু ছিলেন যথা--

"শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার।
তাঁ সবার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার॥" (চৈ-চ-আদি ১ম পরিচ্ছেদ)

কথিত আছে যে "চৈতন্যচরিতামৃত" রচনাকালে গোস্বামী গোপালভট্ট কৃষ্ণদাস কবিরাজকে তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে নিষেধ করেন। ভট্ট গোস্বামীর একান্ত যশোনিঃস্পৃহাই যে ইহার একমাত্র কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। সে যাহা হউক কৃষ্ণদাসরচিত "ভক্তমাল" গ্রন্থে (২য় মালায়) এই রঘুনাথ ভট্টের বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে; তাহা হইতে কতিপয় ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে—

"মহাপ্রভু যবে তীর্থ ভ্রমিবারে গেলা।
ভট্টমারী গ্রামে চাতুর্ম্মাস্য স্থিতি কৈলা॥
শ্রীমান্ বেঙ্কট নামে ভট্ট মহাশয়।
তাঁহার গৃহেতে রহে হইয়া সদয়॥
তাঁহার নন্দন শ্রীগোপাল ভট্ট নাম।
সদাই করয়ে সে প্রভুর সেবাকাম॥
প্রভু তারে কৃপা করি শক্তি সঞ্চারিল।
হরিনাম মহামন্ত্র কর্ণেতে অর্পিল॥
*   *   *   *
বিষয় ছাড়িয়া বৃন্দাবনে আকর্ষিল।
শ্রীরাধারমণ রূপে বড় কৃপা কৈল॥"

শেষ পংক্তির ব্যাখ্যায় উক্ত গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে, গোপালভট্ট একটি শালগ্রামচক্রের উপাসক ছিলেন। একদা কোন ধনিভক্ত তাঁহার বিগ্রহের জন্য অলঙ্কার বস্ত্রাদি আনিয়া দেন। গোপালভট্ট শালগ্রামকে শ্রীমূর্ত্তির যোগ্য বস্ত্রালঙ্কার পরাইতে না পারিয়া অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া রাত্রিযাপন করেন। কথিত আছে যে প্রভাতে দেখা গেল শালগ্রামচক্র

ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম মুরলীবদন কৃষ্ণরূপ ধারণ করিয়াছেন। গোপালভট্ট সম্বন্ধে অপর কোন বৃত্তান্ত জানা যায় না। ইনি দাক্ষিণাত্যবাসী হইয়াও যে বঙ্গীয় বৈষ্ণব আচার্য্যগণ মধ্যে অতি প্রধান স্থান লাভ করিয়াছিলেন, এতদ্দ্বারাই তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও ভক্তির বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এই সময়ে ব্রজধামে বল্লভাচার্য্য, বিঠ্ঠলনাথ, কৃষ্ণদাস পয়আহারী প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ জীবিত থাকিলেও বঙ্গীয় বৈষ্ণবসমাজে গোপালভট্টই সমধিক পূজিত ছিলেন। ইহাঁর অসাধারণ গৌরাঙ্গভক্তিই তাহার প্রধান কারণ।

২য়—গোপাল দাস। মহাপ্রভুর শাখাগণনায় ইহাঁর উল্লেখ দেখা যায়—

"রামচন্দ্র কবিচন্দ্র শ্রীগোপালদাস।" (চৈ-চ আদি ১০ম)

৩য়—গোপাল আচার্য্য। মহাপ্রভুর শাখাগণনায় ইহাঁর নাম লিখিত হইয়াছে।

"গোপাল আচার্য্য আর বিপ্র বাণীনাথ। (চৈ-চ আদি ১০ম)

৪র্থ—কাশীর গোপাল ভট্টাচার্য্য। ইনি মায়াবাদী বৈদান্তিকপণ্ডিত গোপালাচার্য্যের ছাত্র, নীলাচলে মহাপ্রভুর সহচর ভগবান্ ভট্টাচার্য্যের ভ্রাতা ছিলেন। গোপালের মুখে মায়াবাদ শ্রবণে ধর্ম্মনষ্ট হইবে বলিয়া ভগবান্ ভট্টাচার্য্য ইহাঁকে নীলাচল হইতে দেশে পাঠাইয়া দেন। (চৈ-চ অন্ত্য ২য় পরিচ্ছেদ)

৫ম—নিত্যানন্দের সহচর গোপাল—

"নর্ত্তক গোপাল রামভদ্র গৌরদাস।" (চৈ-চ-আদি ১১শ)

এই সকল গোপালের মধ্যে গোপালভট্টের পদের সহিত কাহারও পদ মিশিবার সম্ভাবনা নাই। গোপালভট্ট খাঁটি ব্রজভাষায় (তথাকথিত ব্রজবুলি নহে) পদরচনা করিয়াছেন। যদিও কালক্রমে লেখকগণের হস্তে বিদ্যাপতির মৈথিলপদাবলীর ন্যায় ব্রজভাষার পদগুলিও বঙ্গদেশে প্রচারিত হইয়া কিয়ৎপরিমাণ বিকৃত হইয়াছে, তথাপি তাহা বাঙ্গালা ও তথাকথিত ব্রজবুলি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিষ। গোপাল ভট্টের ভণিতাযুক্ত পদটি বাঙ্গালা ও ব্রজবুলি পদের সহিত তুলনা করিলেই ইহা বুঝা যাইবে। এই ব্রজভাষা ও তথাকথিত ব্রজবুলি সম্বন্ধে স্থানান্তরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করার ইচ্ছা আছে। ভাষাগত প্রমাণ দর্শনে "গোপালদাস" ভণিতার ২৮৮৪ সংখ্যক পদটিও গোপালভট্টের রচিত বলিয়া প্রতীতি হয়। ভাষার বিশেষত্ব ভিন্ন গোপালভট্টের পদে আর কিছু বিশেষত্ব নাই। "গোপাল" ও "গোপালদাস" ভণিতাযুক্ত অবশিষ্ট পদগুলি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে এক মায়াবাদী গোপালের কথা ছাড়িয়া দিলে অবশিষ্ট 'গোপাল'গণ সকলেই তুল্যভাবে এই সকল পদের কৃতিত্বের দাবি করিতে পারেন। বিশেষ প্রমাণের অভাবে এই সকল পদের রচয়িতা সম্বন্ধে কিছুই স্থির করিতে পারা যায় না। গোপালদাসের পদ "পদামৃতসমুদ্রে" উদ্ধৃত হইয়াছে, সুতরাং পদকর্ত্তা গোপালদাস যে রাধামোহন ঠাকুরের পূর্ব্ববর্ত্তী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। রচনাদর্শনে ১৮০।৩৯৪।১২৫৫ সংখ্যক পদগুলি একজনের রচিত হওয়াই সম্ভব বোধ হয়। পদগুলি কবিত্বাংশে মন্দ নহে।

(১৬)

গোপী।

২৪৯৩ সংখ্যক পদ। গোপীকান্ত—পদসমষ্টি ৪। পদসংখ্যা—৫৯৫।৫৯৬।২৩১০।২৯৪৯।

গোপীরমণ—১৬০৫ সংখ্যক পদ।

"চৈতন্যচরিতামৃতে" নবদ্বীপবাসী গৌরাঙ্গভক্তগণের মধ্যে গোপীকান্তের উল্লেখ দেখা যায়—

"শ্রীনিধি মিশ্র গোপীকান্ত মিশ্র ভগবান্।" (চৈ-চ-আদি ১০ম)

গোপীকান্তের ভণিতাযুক্ত পদগুলির আলোচনা দ্বারা "গোপীকান্ত" নামধারী দুইজন গোপীকান্তের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। চৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণিত গোপীকান্ত যে মহাপ্রভুর সমসাময়িক উক্ত গ্রন্থপাঠে এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। পক্ষান্তরে ২৩১০ সংখ্যক পদের রচয়িতা গোপীকান্ত প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীনিবাস আচার্য্যের ভগবদ্ভক্তি ও ভক্তিগ্রন্থ প্রচারের গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য মহাপ্রভুর অনেক পরবর্ত্তী। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত পদের রচয়িতা গোপীকান্ত চৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণিত গোপীকান্ত হইতে বিভিন্ন ব্যক্তি। গোপীকান্তের ভণিতাযুক্ত সমস্ত পদই এই গোপীকান্তের রচিত কি না— তৎসম্বন্ধে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে—৫৯৫।৫৯৬ সংখ্যক পদের রচনা হইতে অবশিষ্ট পদ দুটির রচনা বিভিন্ন প্রকৃতির। বিষয়ভেদে ভাষা ও ভাবের এইরূপ বৈষম্য হওয়াও বিচিত্র নহে, সুতরাং এ সম্বন্ধে নিশ্চয় কোন কথা বলা যায় না। শ্রীনিবাস আচার্য্যের পরে ও বৈষ্ণবদাসের পূর্ব্বে ইহাঁর কাল নির্ণীত হইতেছে, সুতরাং ইনি সপ্তদশ শতাব্দীর লোক।

গোপীরমণ সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না। ইহাঁর পদটি কবিত্বাংশে উত্তম।

গোপী—এই নামটি গোপীকান্ত, গোপীরমণ বা গোপীনাথ ইত্যাদি কোন্ নামের সংক্ষেপ তাহা ঠিক বলা যায় না। চৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার ১০ম পরিচ্ছেদে দুইজন গোপীনাথের উল্লেখ আছে। গোপী নামাঙ্কিত পদটি এই সকলের মধ্যে কোন ব্যক্তি বা অন্য কাহারও রচিত কি না তাহা বলিবার উপায় নাই।

(১৭)

গোবর্দ্ধন।

পদসমষ্টি—১৬।

পদসংখ্যা—১২৩৫।১৪৩৯।১৪৫০।১৪৫১।১৪৫৩।১৪৫৫-১৪৫৭।১৪৭০-১৪৭৬।১৫৬৯।

গোবর্দ্ধন দাস সুকবি ছিলেন; দুঃখের বিষয় তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। "পদামৃতসমুদ্রে" ইহাঁর কোন পদ উদ্ধৃত হয় নাই। সম্ভবতঃ ইনি রাধামোহন ঠাকুরের পরবর্ত্তী ছিলেন। ইনি বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ও ব্রজবুলি এই উভয়বিধ পদই রচনা করিয়াছেন— ১২৩৫।১৪৫০।১৪৭৪।১৫৬৯ সংখ্যক পদগুলি বাঙ্গালা রচনার ও অবশিষ্ট পদগুলি তাঁহার ব্রজবুলি রচনার দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাঁর উভয়বিধ পদই সুললিত—

"গৌর বরণ, হিরণ কিরণ,
অরুণ বসন তায়।
রাতা উৎপল, নয়ন যুগল,
প্রেম ধারা বহি যায়"

এবং "বিহরে শ্যাম, নবীন কাম,
নবীন বৃন্দা-বিপিন ধাম
সঙ্গে নবীন, নাগরীগণ,
নব ঋতুপতি রাতিয়া"

ইত্যাদি পদগুলি রচনা ও বর্ণনার মাধুর্য্যে বৈষ্ণব কবিগণের উৎকৃষ্ট পদ মধ্যে গণনীয়। যে সকল বৈষ্ণব কবি বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ও ব্রজবুলি এই উভয়বিধ পদ-রচনায় সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম বলিয়া গোবর্দ্ধনের নাম উল্লেখযোগ্য।

(১৮)

গোবিন্দ ঘোষ।

পদ সমষ্টি ৬।

পদসংখ্যা—১০২৬।১৫৯৪।১৬০৩।১৬১৯।২০৫৭।২০৭৫।

গোবিন্দ ঘোষ মাধব ও বাসুদেব নামক ভ্রাতৃদ্বয় সহ মহাপ্রভুর সমসাময়িক এবং তাঁহার একান্ত অনুগত ভক্ত ছিলেন। ইহঁার বাসস্থান কোথায় ছিল তাহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। পুরাতত্ত্বানুসন্ধিৎসু কোন কোন ব্যক্তি ইহঁাদিগের জন্ম-স্থান কুলীনগ্রাম ও কেহ নবদ্বীপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—কিন্তু চৈতন্য-ভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে কুত্রাপি ইহঁাদিগের নাম কুলীনগ্রামবাসিগণের গণনায় উল্লিখিত হয় নাই। ইহঁাদিগের নিবাস যে নবদ্বীপে ছিল এরূপ স্পষ্ট উল্লেখও আমরা কোন স্থলে প্রাপ্ত হই নাই। যাহা হউক মহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণের পর দাক্ষিণাত্যভ্রমণ হইতে নীলাচলে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাঁহার দেশভ্রমণের সহচর কৃষ্ণদাস দ্বারা নবদ্বীপের ভক্তমণ্ডলীর নিকট সংবাদ পাঠাইলে সেই বৎসর তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন উপলক্ষে যে সকল ভক্ত নীলাচলে গমন করিয়াছিলেন—তন্মধ্যে আমরা এই তিন ভ্রাতার উল্লেখ পাই। গোপীনাথ ভট্টাচার্য্য ইহঁাদিগকে দেখাইয়া রাজা প্রতাপরুদ্রকে বলিয়াছিলেন,—

"গোবিন্দ মাধব ঘোষ এই বাসু ঘোষ.
তিন ভাইর কীর্ত্তনে প্রভু পায়েন সন্তোষ॥"

ইহা দ্বারা বোধ হয় যে, ইহঁারা নবদ্বীপে আদি-লীলার সময়েও মহাপ্রভুর সহচর ছিলেন। পূর্ব্ব-বর্ণিত ভক্তমণ্ডলী লইয়া মহাপ্রভু জগন্নাথ দেবের রথের সম্মুখে যে উদ্দাম নৃত্য করেন তৎসময়ে এই গোবিন্দ ঘোষ—চারিটি প্রধান কীর্ত্তন-সম্প্রদায়ের মধ্যে একটীর দলপতি হইয়াছিলেন,—তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়ও ঐ সম্প্রদায়ে গান করেন।

"গোবিন্দ দাস প্রধান হৈল আর সম্প্রদায়।
হরিদাস বিষ্ণুদাস রাঘব যাহা গায়॥
মাধব বাসুদেব ঘোষ দুই সহোদর।
নৃত্য করেন তাহা পণ্ডিত বক্রেশ্বর॥" (চৈ-চ মধ্য ১৩শ)

এই স্থলে বর্ণিত আছে যে পূর্ব্বোক্ত চারিটি প্রধান কীর্ত্তন সম্প্রদায় ভিন্ন কুলীনগ্রামবাসী ভক্তগণ ও শ্রীখণ্ডবাসী ভক্তগণ দ্বারা অন্য দুইটি কীর্ত্তন সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর তৃতীয় বৎসরে গৌড়ীয় ভক্তগণ নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত নীলাচলে গমন করিলে—রথদর্শনান্তে মহাপ্রভুর আজ্ঞায় গৌড়ে প্রত্যাবৃত্ত হন। এই সময়ে মাধব ও বাসুদেব ঘোষ তাঁহার সহচর ছিলেন। গোবিন্দ মহাপ্রভুর নিকটই অবস্থান করেন।

"প্রভু আজ্ঞায় নিত্যানন্দ গৌড়েতে চলিলা।
তাঁর সঙ্গে তিন জন প্রভু আজ্ঞায় আইলা॥
শ্রীরামদাস মাধব বাসুদেব ঘোষ।
প্রভু সঙ্গে গোবিন্দ রহে পাইয়া সন্তোষ॥" (চৈ-চ আদি ১০ পরিচ্ছেদ)

গোবিন্দ ঘোষ "গোবিন্দ দাস" ভণিতায় কোন পদ রচনা করিয়া থাকিলে, তাহা গোবিন্দদাসের পদাবলী হইতে পৃথক্ করা এক প্রকার অসাধ্য। সম্ভবতঃ "গোবিন্দ ঘোষ" ভণিতার পদগুলি ইহাঁরই রচনা। গোবিন্দ ঘোষের সকল পদই গৌরাঙ্গবিষয়ক ও বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় রচিত, উহাদিগের কবিত্ব যেরূপেই হউক—গৌরাঙ্গভক্ত ও পুরাতত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের নিকট এই পদগুলি অমূল্য। মহাপ্রভুর বঙ্গভাষায় জীবন-চরিত-লেখকগণ কেহই তাঁহার সমসাময়িক নহেন, তাঁহাদিগের বর্ণিত বৃত্তান্তের সত্যতার জন্য জন্য তাঁহাদিগকে সমসাময়িক ব্যক্তিগণের লিখিত ও মৌখিক বৃত্তান্তের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। গোবিন্দ ঘোষের পদগুলি সেরূপ নহে। গোবিন্দ ঘোষের পদাবলীতে মহাপ্রভুর জীবনের যে কয়েকটি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে গোবিন্দ ঘোষ সে সকল নিজ চক্ষে দেখিয়াছেন, এরূপ বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। যাঁহারা মহাপ্রভুর জীবন-চরিতের ঐতিহাসিকতার সমালোচনা করিবেন তাঁহাদিগের পক্ষে গোবিন্দানন্দ, বাসুদেব, মাধব, রামানন্দ বসু প্রভৃতি মহাপ্রভুর সমসাময়িক ব্যক্তিগণের বর্ণিত বিবরণ সহ গোবিন্দ ঘোষের পদাবলী যত্নের সহিত আলোচ্য বটে।

(১৯)

গোবিন্দ দাস

গোবিন্দ নামধারী কোন্ কোন্ ব্যক্তি যে এই ভণিতায় পদ রচনা করিয়াছেন তাহা নিশ্চিতরূপে বলা কঠিন। পদাবলী-সাহিত্যে গোবিন্দ নামধারী কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির বিবরণ জানা যায়। এ স্থলে তাঁহাদিগের উল্লেখ করা আবশ্যক।

১ম। গোবিন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী।

ইনি নবদ্বীপবাসী ও মহাপ্রভুর আদি-লীলার সহচর ও পরমভক্ত ছিলেন। আদিলীলার শ্রীবাসমন্দিরে প্রতি রজনীতে সঙ্কীর্ত্তন প্রসঙ্গে ইহাঁর উল্লেখ আছে ;—

"শ্রীবাস মন্দিরে প্রতি নিশার কীর্ত্তন।
কোন দিন হয় চন্দ্রশেখর ভবন ॥
* * * *
গোবিন্দ গোবিন্দানন্দ সকল তথাই ॥" (চৈ-ভা-মধ্য ৮ম)
"প্রভুর প্রিয় গোবিন্দানন্দ মহাভাগবত।" (চৈ-চ আদি ১০)

মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণান্তে নীলাচলে অবস্থিতি করিলে ইনি প্রভুর আজ্ঞায় প্রতি বৎসর অন্যান্য ভক্তগণসহ নীলাচলে প্রভু দর্শনার্থ গমন করিতেন।

"ঈশ্বর আজ্ঞায় প্রতি বৎসরে বৎসরে।
সবে আইলেন রথ যাত্রা দেখিবারে ॥
* * * *
চলিল গোবিন্দানন্দ প্রেমেতে বিহ্বল।
দশ দিক্ হয় যার স্মরণে নির্ম্মল ॥" (চৈ-ভা শেষ ষষ্ঠ)

সুকবি ছিলেন। "গোবিন্দদাস" ভণিতাযুক্ত ইহাঁর চারি পদ রাধামোহন ঠাকুর সমুদ্র গ্রন্থের সংস্কৃত টীকায় "শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তিঠকুর কৃত" বলিয়া লিখিয়াছেন। রাধামোহন ঠাকুর ইহাঁর অনেক পরবর্ত্তী—তাঁহার সময়ে যে গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর অনেকগুলি পদ "গোবিন্দদাসের" ভণিতায় মিশিয়া গিয়াছিল তাহা সহজেই বোধ হয়, কারণ উক্ত গ্রন্থে চারিটী পদ ভিন্ন আর কুত্রাপি গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর নাম নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। সে যাহা হউক রাধামোহন ঠাকুরের নির্দ্দেশ অনুসারে পদকল্পতরুর ১৩৩।২৬৭।২৭৭।১৮৮৬ সংখ্যক পদগুলি গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর রচিত বলিয়া স্থিরীকৃত হইতেছে।

চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের পদগুলি বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় রচিত। পদগুলির ভাব ও কবিত্ব বড়ই মধুর—গোবিন্দদাস কবিরাজের উৎকৃষ্ট ভাবপ্রধান পদাবলী হইতে এগুলি বাছিয়া লওয়া দুঃসাধ্য।

২য়। গোবিন্দদত্ত। ইহার নিবাস নবদ্বীপ। ইনি অতি সুগায়ক ছিলেন,—নবদ্বীপে শ্রীবাসমন্দিরে মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তনকালে ইনি গান করিতেন ;—

"প্রভুর কীর্ত্তনিয়া আদি শ্রীগোবিন্দ দত্ত।" (চৈ-চ- আদি ১০ম)

ইনি কোন পদ রচনা করিয়াছেন কিনা জানা যায় না, করিয়া থাকিলে তাহা সম্ভবতঃ গোবিন্দদাসের পদের সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

৩য়। ঈশ্বর পুরীর শিষ্য গোবিন্দ। ইনি গুরুর আজ্ঞায় তাঁহার দেহত্যাগ হইলে নীলাচলে আসিয়া মহাপ্রভুর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হন।

"ঈশ্বরপুরীর শিষ্য ব্রহ্মচারী কাশীশ্বর।
শ্রীগোবিন্দ নাম তার প্রিয় অনুচর ॥

তাঁর সিদ্ধিকালে দোঁহে তাঁর আজ্ঞা পাইয়া।
নীলাচলে প্রভুর স্থানে মিলিলা আসিয়া॥" (চৈ-চ-আদি ১০ম)

এই গোবিন্দের বিবরণ চৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্য খণ্ডে অনেকস্থলে পাওয়া যায়, বাহুল্য-ভয়ে তাহা উদ্ধৃত হইল না। এই গোবিন্দ যে কোন পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন এরূপ জানা যায় না।

৪র্থ। বর্ণিত কাশীশ্বর ব্রহ্মচারীর শিষ্য গোবিন্দ গোঁসাই। ইনি বৃন্দাবনবাসী ছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজকে চৈতন্যচরিতামৃত প্রণয়ন করিতে যে সকল ব্যক্তি উৎসাহিত করেন ইনি তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম। (চৈ-চ-আদি ৮ম পরিচ্ছেদ) ইনি কোন পদরচনা করিয়াছেন কিনা জানা যায় না।

৫ম। ব্রজবাসী সুপ্রসিদ্ধ বল্লভাচার্য্যের পুত্র বিঠ্‌ঠলনাথের শিষ্য গোবিন্দদাস। ইহাঁর অলৌকিক বৃত্তান্ত কৃষ্ণদাসের "ভক্তমাল" গ্রন্থের একবিংশতি মালায় বর্ণিত হইয়াছে। ইনি রূপ সনাতন ও জীবগোস্বামীর সমসাময়িক ব্যক্তি। সম্ভবতঃ ইনি বাঙ্গালা ব্রজবুলি বা ভাষায় কোন পদ রচনা করেন নাই।

৬ষ্ঠ। মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সহচর ও কড়চা লেখক-গোবিন্দ কর্ম্মকার। "বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য" নামক পুস্তকে শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় যথেষ্ট সহৃদয়তার সহিত গোবিন্দের কড়চার বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াছেন। ইনি কোন পদ রচনা করিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না, করিয়া থাকিলে তাহা 'গোবিন্দ দাস' ভণিতাযুক্ত পদাবলীর সহিত মিশিয়া গিয়াছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়।

প্রথম কুমারগুপ্তের দু'খানি খোদিতলিপি

উপরি উক্ত দু'খানি খোদিতলিপির একখানি শিলাফলক ও অপরখানি তাম্রফলক। যেখানি শিলাফলক সেখানি একখানি আটকোণা পাথর ও তাহার উপর একটী শিবলিঙ্গ অধিষ্ঠিত। পাথরখানি ধূসরবর্ণের বালুকাপ্রস্তরের সগোত্র। ইহা ফয়জাবাদ জেলার ভরডি ডিহ নামক গ্রামের সম্পত্তি। অধুনা কিন্তু ইহা লক্ষৌএর যাদুঘরে আনিয়া রাখা হইয়াছে। আমি যখন লক্ষৌ যাদুঘরে শিলাসমবায়ের তালিকা প্রস্তুত করি, তখন ইহা আমার নয়নগোচর হয়। ইহার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইংরাজি ১৯০৭-০৮ সালে ডাক্তার ভোগেল সাহেব তাঁহার বাৎসরিক বিবরণীতে প্রকাশ করেন।

লিপিখানি আটকোণা পাথরের পাঁচদিকের মুখে খোদিত হইয়া সম্পূর্ণ হইয়াছে। প্রতি-মুখে এগার করিয়া পংক্তি আছে। প্রতি পংক্তি মোটামুটি এক ফুট্ ছয় ইঞ্চি করিয়া লম্বা। অক্ষরগুলি দৈর্ঘ্যে ১⅛"। লিপিতে প্রথম কুমারগুপ্তের রাজ্যকাল বলিয়া উল্লেখ আছে এবং কথায় একশত সতর এই সংবৎ দেওয়া আছে এবং কার্ত্তিক মাসের দশ তারিখে ইহা উৎকীর্ণ হইল বলা আছে। এই ১১৭ সংবৎ গুপ্তসংবৎ, সুতরাং ইহা খৃষ্টীয় ৪৩৫-৩৬ অব্দের।

এ লিপিখানির উদ্দেশ্য শৈলেশ্বর নামক মহাদেবের পদপ্রান্তে প্রতিষ্ঠিত পৃথিবীশ্বর মহাদেবের উদ্দেশে কিঞ্চিৎ দান। এক মহাদেবের পদপ্রান্তে আর এক মহাদেবের স্থাপনা কথাটা বেশ একটু নূতন।

লিপিখানির শেষ অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যতদূর আছে তাহাতে দাতার নাম ও বংশাবলী পাওয়া যায়। বংশাবলীটীতে বেশ একটী আবশ্যকীয় সন্ধান পাওয়া যায়। দাতা একজন ব্রাহ্মণ, নাম পৃথিবীসেন। ইনি প্রথমে প্রথম কুমারগুপ্তের মন্ত্রী ও কুমারামাত্য থাকেন, তৎপরে প্রধান সেনাপতি হন। ইহার পিতা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী ছিলেন। এই খবরে ইহা বেশ বুঝা যায় যে গুপ্তদিগের রাজত্বকালে তাঁহাদের কোন কোন রাজকীয় কার্য্যে কর্ম্মচারিগণ বংশপরম্পরায় নিযুক্ত হইতেন। আমাদের দেশে এ রীতি গুপ্তদিগের পরেও দেখা যায়। বাঙ্গালার পালেরা ও কনৌজের গহড়বাড়েরা তাঁহাদের কর্ম্মচারীদিগের পৈতৃক দাওয়া মাস্ত করিয়া চলিতেন।

অত বড়পদে অধিষ্ঠিত পৃথিবীসেন ও তাঁহার পিতা শিখরস্বামীর নাম গুপ্তদিগের অপর কোন খোদিতলিপিতে পাওয়া যায় নাই।

এ লিপিখানির ভাষা সংস্কৃত ও গদ্যে লিখিত। খোদাই কার্য্যটী বড় অযত্নে হইয়াছিল, যেহেতু ইহাতে সংখ্যাতীত ভুল দেখিতে পাওয়া যায়।

মূল

(১) নমো মহাদেবায় মহারাজাধিরাজ শ্রী[চন্দ্র]গুপ্ত [পাদা]

(২) নুধ্যাতস্য চতুরুদধিসলিলাস্বাদিতয [শসো মহারাজা]

(৩) ধিরাজশ্রীকুমারগুপ্তস্য বিজয়রাজ্য সংবৎসরশতসপ্তদশোত্ত[র]

(৪) কার্ত্তিকমাসদশমদিবসে স্যান্দিবসপূর্ব্বায়াং ন(?)ন্দগাচর্য্যাশ্ববাজি

(৫) সগোত্র কুরমরঙ্‌য়ভট্টস্য পুত্রো বিষ্ণুপালিতভট্টস্তস্য পুত্র মহরা

(৬) জধিজাজ শ্রীচন্দ্রগুপ্তস্য মন্ত্রী কুমারামাত্য শিখরস্বাম্যভূৎ তস্য পুত্রঃ

(৭) পৃথিবিসেনো মহারাজাধিরাজশ্রীকুমারগুপ্তস্য মন্ত্রী কুমারা-ম্যাত্যো ন

(৮) ন্তরং চ মহাবলাধিকৃতঃ ভগবতো মহাদেবস্য পৃথিবীশ্বরঃ ইত্যেবং সমাখ্যাতস্য

(৯) স্বৈবযথাকর্ত্তব্য ধার্ম্মিককর্ম্মণা পাদশুশ্রুষণায় ভগবচ্ছৈ

(১০) লেশ্বরস্বামি মহাদেবপাদমূলে আযোধ্যকনানাগোত্রচরণত্রপঃ(?)

(১১) স্বাধা……স…তভেষে……পারগত……দেবদো…গা

অনুবাদ

মহাদেবকে নমস্কার। মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্রগুপ্তের শ্রীচরণানুধ্যানকারী চতুঃসমুদ্রসলিলাস্বাদিতযশা মহারাজাধিরাজ শ্রীকুমারগুপ্তের শুভ রাজ্যকালে একশত সত্তর সংবতের কার্ত্তিকমাসের দশ তারিখে ঐ দিনে মহারাজাধিরাজ শ্রীকুমারগুপ্তের মন্ত্রী কুমারামাত্য এবং তদনন্তর প্রধান সেনাপতি পৃথিবীসেন যাঁহার পিতা বিষ্ণুপালিত ভট্টের পুত্র কূর্ম্মরঙ্গ ভট্টের পৌত্র শিখরস্বামী মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রীও কুমারামাত্য ছিলেন তিনি ভগবান্ শৈলেশ্বরস্বামি মহাদেবের পাদমূলে (প্রতিষ্ঠাপিত) পৃথিবীশ্বর নামধেয় ভগবান্ মহাদেবের পাদবন্দনার জন্য যথাবিহিত ধর্ম্মানুমোদিত কর্ম্মানুসারে………………………………… ।

তাম্রফলক

এ খানি জেলা রাজসাহীর মহকুমা নাটোরের অন্তর্গত বরৈগ্রাম থানার অধীন ধনৈদহ গ্রামের নিকটে পাওয়া যায়। উক্ত গ্রামের জমীদার নাটোরনিবাসী শ্রীযুক্ত মৌলবী ইশাদ আলি খান চৌধুরীর নিকট হইতে রাজসাহী আদালতের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় সংগ্রহ করেন এবং ১৯০৬-০৭ সালে কলিকাতা দেশীয় শিল্প-প্রদর্শনীর জন্য সাহিত্য-পরিষদের অধ্যক্ষের অনুরোধে তিনি ইহা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে প্রেরণ করেন। প্রদর্শনীর অন্তে পরিষদের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু ব্যোমকেশ মুস্তফী ইহার পাঠোদ্ধারের জন্য আমায় দেন।

এ খানি একখানি অতি জীর্ণ তাম্রফলক। উপরকার দিকের দক্ষিণাংশের এবং নীচেকার বামাংশের অনেকখানি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহার পরিমাণ ৫½″ × ৫½″ ইহাতে ১৭টী পংক্তি আছে। ইহার ভাষা সংস্কৃত ও অধিকাংশই গদ্যে লিখিত, শেষে কয়েকটী পদ্য আছে। এ খানি সনতারিখ যুক্ত, ইহার সন ১১৩ (গুপ্তসংবৎসর) সুতরাং এ খানি খৃষ্টীয় ৪৩১-৩২ অব্দের, অতএব ইহা প্রথম কুমারগুপ্তের রাজ্যকালের। এ যাবৎ যত তাম্রফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে সে সব হইতে এ খানি বয়সে প্রাচীন, সুতরাং ইহা একখানি নূতন আবিষ্কার। অবশ্য আমি ভূমিদানবিষয়ক তাম্রফলক সম্বন্ধেই বলিতেছি। এই ফলকখানি যখন প্রদর্শনীতে দেওয়া হয় তখন ইহাতে "কুমার" এ পদবী দেখিয়াছিলাম পরে সে অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

(১) .... [কুমারগুপ্তরাজস্য] স্বৎসরশতত্রয়োদশূত্ত[র]

(২) .... [অস্যা]ন্দিবসপূর্ব্বায়াং পরম দৈবতপর[ম]..........

(৩) .... ক্ষুদ্র[ক নিবাসিনঃ] ব্রাহ্মণ শিবশর্ম্ম নাগশর্ম্ম মহ.......

(৪) .... [দে]বকীর্ত্তিক্ষমবন্তগোষ্ঠক বগর্গপাল পিঙ্গল শু(?) ক্ষুককাল......

(৫) .... বীষ্যদেবশর্ম্ম বিষ্যভদ্র খুষক রুমকগোপাল......

(৬) ...... শিভদ্রমপহরণভ্যা গ্রামাষ্টস্থকুলাধিকরণ......

(৭) চরণ...বিজ্ঞাপিত......মহাখুষাপারবিষয়ে নিবত্তমর্য্যাদাস্থিতি...

(৮) ... নীবীধর্ম্মক্ষয়ালভ্যা......দইত থমাসাদ্যমনুবক্রলেনবা......

(৯) ... পলে(?) ত্যভিহিতা সর্ব্বলংব. .কর প্রতিপ্রতিকুটুম্বিভিরব-স্থাপ্যক......

(১০) ... পরিত্যক্তেন যবি...চ......দহ্বকমিতি যতস্ত[া] জতি-প্রতিপাদ্য......

(১১) বরনালকসদ (?) বি...ছ্য.........কৃত্যবসলক (?) দত্ত ততঃ সুযুক্তক......

(১২) ······ ভূ (?) কটক বন্তেভ্য (?) ছান্দশ ব্রাহ্মণ বরাহস্বামিনে দত্তং তদ্ব······

(১৩) ······ ভূম্যাদানক্ষপ (?) চ শুণু (?) গুণমনুচিন্ত্য শরীরকল্যা (?) নকস্থ চো······

(১৪) শ উক্তঞ্চ ভগবতাদ্বৈপায়নেন। স্বদত্তাং পরদত্তাম্বা·········

(১৫) ··· তৃভিঃ সহ পচ্যতি ষস্টি[ং] বর্ষসহস্রাণি স্বগর্গে মোদতি ভূমিদ[ঃ] ······

(১৬) ··· পূর্ব্বদত্তাং দ্বিজাতিভ্য যত্নাদ্রক্ষ যুধিষ্ঠিরমহী[ং]·········

(১৭) ······ [ও] যং শ্রীভদ্রেণ উৎকীর্ণ্ণং স্বপ্নেশ্বর দাসে[ন]······

ইহার অনুবাদ সম্ভবপর নহে। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে ক্ষুদ্রক গ্রামবাসী শিবশর্ম্মা ও নাগশর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণদ্বয়কে মহাখুষাপার বিষয়ান্তর্গত কোন গ্রাম বা ভূমি প্রদত্ত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বিষ্যদেবশর্ম্মন্ (বিশ্বদেবশর্ম্মন্) ও বিষ্য (বিশ্ব) ভদ্র নামক ব্যক্তিদ্বয় ও আটটী গ্রামের অধ্যক্ষের (গ্রামাষ্টকুলাধিকরণ) নাম উল্লেখ আছে। নীবীধর্ম্ম-ক্ষযমালভ্য ইত্যাদি বাক্যে স্পষ্ট বুঝা যায় যে প্রদত্ত ভূমি বা গ্রাম পূর্ব্বে কোন ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত হইয়াছিল বা কোন ব্রাহ্মণের অধিকারে ছিল এবং তাহার মালিকান স্বত্ব রহিত করাইয়া উপরোক্ত ব্রাহ্মণদ্বয়কে দান করিতে হইয়াছে। এরূপ দৃষ্টান্ত প্রাচীন খোদিতলিপিসমূহে অতীব বিরল। নীবীধর্ম্মের কথা পূর্ব্বে মহারাজ শিবরাজের তাম্রশাসনে প্রকাশ করিয়াছি। খোদিতলিপির শেষভাগে বরাহস্বামী নামক জনৈক ব্রাহ্মণের নাম পাওয়া যায়। "বরাহ-স্বামিনে দত্তং" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা অনুমান হয় ইহা পূর্ব্বে বরাহস্বামীকেই দেওয়া হইয়াছিল। বরাহস্বামী ছান্দস (সামবেদীয়) ব্রাহ্মণ ছিলেন। খোদিতলিপির শেষ পংক্তিতে বলা আছে যে ইহা স্বপ্নেশ্বর দাসকর্ত্তৃক খোদিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই খোদিতলিপি হইতে আর কিছু বলিবার যোগ্য কথা নাই।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

———

১৩১৫ সালের বঙ্গ-সাহিত্যের বিবরণ

বৎসরের মধ্যে যত বাঙ্গালা-পুস্তক প্রকাশিত হয়, বৎসরের শেষে 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্', ১৩০৯ সাল হইতে তাহার একটা বিবরণ প্রস্তুত করিয়া আসিতেছেন। ১৩১১ সাল পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের উপর এই কার্য্যের ভার ছিল। ১৩১২ বঙ্গাব্দ হইতে এই বিবরণ প্রস্তুতের ভার, আমার উপর অর্পিত হয়। তদনুসারে আমি অদ্য ১৩১৫ সালে প্রকাশিত বঙ্গ-সাহিত্যের বিবরণ লইয়া আপনাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছি। এই বিবরণে অসম্পূর্ণতা-ত্রুটি যথেষ্টই পরিলক্ষিত হইবার সম্ভাবনা। তজ্জন্য পূর্ব্বেই একটা কৈফিয়ৎ দিয়া রাখিতেছি। বাঙ্গালাদেশে কোথায় কখন্ কি পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে, তাহা জানিবার আপাততঃ কোন উপায় নাই। অলিতে গলিতে মুদ্রাযন্ত্র। কত বই ছাপা হইতেছে, তাহার সংবাদ কে রাখে? অবশ্য সরকারী আফিসে সাধারণতঃ, প্রত্যেক মুদ্রিত গ্রন্থের একখণ্ড মুদ্রাকর-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া থাকে। বেঙ্গল লাইব্রেরিতে যে সমস্ত মুদ্রিত পুস্তকাদি প্রেরিত হয়, তিন মাস অন্তর তাহাদের একটী সরকারী তালিকা প্রকাশিত হইয়া থাকে; কিন্তু দুঃখের বিষয়—এই তালিকাটী অত্যন্ত অসম্পূর্ণভাবে নিতান্ত অ-সময়ে প্রকাশিত হইয়া থাকে। বিগত ৮ই মে পর্য্যন্ত মোটে ছয় মাসের তালিকা সম্পূর্ণ হইয়াছে। বাকী ছয় মাসের তালিকা পাইবার উপায় নাই। এ অবস্থায় মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক পত্রের সমালোচনা ও বিজ্ঞাপন হইতে, পুস্তকালয়ের গ্রন্থ-তালিকা হইতে গত-বৎসরে প্রকাশিত গ্রন্থের তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে হইবে। পত্র লিখিয়া ফল হয় না—কাজেই মফঃস্বলের না হউক, অন্ততঃ কলিকাতার ছাপাখানাতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নূতন পুস্তকের সন্ধান লইতে হইবে। এইরূপে ও নানাপ্রকারে পুস্তক ও তালিকাদি সংগ্রহ করিতে যাওয়ায় সংগ্রহকার্য্যে ত্রুটি হওয়ারই সম্ভাবনা। তজ্জন্য সকলের নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করিতেছি।

'পরিষদ্', সাহিত্যের পঞ্জী-রক্ষার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিতেছেন—বৎসরের মধ্যে যত বাঙ্গালা গ্রন্থ, প্রকাশিত হয়—তাহার শ্রেণীবিভাগসহ তালিকা প্রস্তুত করিয়া বৎসরান্তে সাহিত্যের গতি ও পরিপুষ্টির আলোচনা করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। কিন্তু, বঙ্গভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থের প্রত্যেক মুদ্রাকর, প্রকাশক বা গ্রন্থকারের সাহায্য ব্যতীত এই কার্য্য, সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। এজন্য পরিষদ্, প্রতিবৎসরই তাঁহার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ও সানুনয় প্রার্থনা জানাইয়া আসিতেছেন। এরূপ স্থলে তাঁহারা যদি তাঁহাদের এক এক খণ্ড বই সাহিত্য-পরিষদে অনুগ্রহপূর্ব্বক পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে সাহিত্য-পরিষদের পাঠাগারে সেগুলি সযত্নে রক্ষিত হইবে এবং বৎসরান্তে আলোচনার সময়ে বহু সাহিত্য-সেবীদের নিকট সেগুলির নাম ও পরিচয় দেওয়া যাইবে।

বঙ্গসাহিত্যের বিবরণ দিবার পূর্ব্বে একটী কথা বলিয়া রাখা উচিত, মনে করিতেছি।

পরিষদের নিয়মানুসারে, আপাততঃ সুসঙ্গত কারণে, পরিষদ্, কোন গ্রন্থের সমালোচনার ব্যবস্থা রাখেন নাই। কাজেই আমাদের এই বিবরণীতে কোন পুস্তকের সমালোচনা থাকিবে না। তবে এই সাহিত্য-বিবরণের মধ্যে সাহিত্যের বিভিন্ন-বিভাগ-সম্বন্ধে গতি লক্ষ্য করিয়া যা'দুই চারি কথা বলা হয়, তাহারও একটা পরোক্ষ ফল, সাহিত্যের উপর ফলে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার একটু আভাস দেখাইতে চেষ্টা করিব। কিন্তু সে চেষ্টায় কেহ যদি ত্রুটি দেখেন, তাহা আমার ত্রুটি বলিয়া বুঝিবেন—পরিষদের নয়।

আলোচ্যবর্ষে বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত অনুন ৬৪৩ খানি নূতন বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু গতবর্ষের মুদ্রিত বাঙ্গালা-পুস্তকের সংখ্যা ৮৭৪। তন্মধ্যে যে সকল পুস্তকের নূতনসংস্করণ হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা ২৩১। এগুলির সংখ্যা, তালিকা-ভুক্ত হয় নাই। ইহার মধ্যে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা, বাঙ্গালা ও সংস্কৃতে প্রকাশিত ৬১৬ খানি পুস্তকের বিষয়ভেদে শ্রেণীবিভাগ করিলে, দেখা যায়—

আলোচ্য বর্ষে,—

কলাবিদ্যায়	১৬
জীবনীতে	২৯
নাটকাদিতে	৪৬
উপন্যাসে	৮৪
ইতিহাস-ভূগোলে	১৮
সাহিত্যে	৩১
আইনে	৩
চিকিৎসায়	৪
দর্শনে	৪
কাব্য ও কবিতায়	৪২
ধর্ম্ম-বিষয়ে	১৯০
ভ্রমণ-বিবরণে	১
বিজ্ঞানে	১৭
বিবিধ বিষয়ে	৮২

মোট ৬১৬ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।

১৩০৯ সাল হইতে ১৩১৫ পর্য্যন্ত মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা তুলনা করিলে, দেখা যায়—

শ্রেণী	১৩০৯	১৩১০	১৩১১	১৩১২	১৩১৩	১৩১৪	১৩১৫
১। কলাবিদ্যায়	৪	৬	৫	৪	৫	৭	১৬
২। জীবনীতে	১৫	১৭	২১	১৮	১৪	১৬	২৯
৩। নাটকাদিতে	৩৭	৪৩	৩৬	৫২	৪২	৩৮	৪৬
৪। উপন্যাসে	৫১	৪৮	৭৫	৬৪	৫৩	৫০	৮৪
৫। ইতিহাস-ভূগোলে	১৫	১৬	২১	২০	১৭	২০	১৮
৬। সাহিত্যে	৯৮	১০৬	১১১	১২৫	১২২	১৪৩	৩৯
৭। আইনে	৪	৬	৫	৫	৪	২	৩
৮। চিকিৎসায়	৩৭	২৮	৩৩	৪০	২৭	৩০	৪৫
৯। দর্শনে	৫	৭	৭	৪	৭	৮	৪
১০। কাব্যে ও কবিতায়	৭৩	৯৯	১০২	৮২	৮৭	১১০	৪২
১১। ধর্ম্মবিষয়ে	৬০	৫২	৮২	৮৪	৭৫	৭০	১৯২
১২। বিজ্ঞানে	৩০	৪৫	৪৮	৫৩	৩৫	২৫	১৭
১৩। বিবিধবিষয়ে	১২৫	১১৩	১০৫	১৫০	১৬৩	২৭০	১০৭
১৪। ভ্রমণ-বৃত্তান্তে	৫	৬	৮	৪	৫	৩	১
মোট	৫৫৯	৫৯২	৬৫৭	৭০৫	৬৭৬	৭৯৫	৬৪৩

১৩১৫ সালে প্রকাশিত বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকা।

বিষয়	নূতন গ্রন্থ প্রথম সংস্করণ		নূতন সংস্করণ	পুনর্মুদ্রণ	অনুবাদ	মোট		স্কুলপাঠ্য	সাধারণপাঠ্য	মোট
	পুস্তক	সাময়িকপত্র	পুস্তক			পুস্তক	সাময়িকপত্র			
১। কলাবিদ্যায়	১৬	১১	৩			১৯	১১	১৫	১৫	৪০
২। জীবনীতে	১৯		১০			২৯			৩৯	৩৯
৩। নাটকাদিতে	৪৬		৪			৫০			৫০	৫৯
৪। উপন্যাসে	৮৪		৩৫	৩	৫	১১৯			১১৯	১১৯
৫। ইতিহাস-ভূগোলে	১৮	৮	১২			৩০	৮	১৫	২৩	৩৮
৬। সাহিত্যে	৩৯		৫১	৭	৩	১০		৮১	৯	৯০
৭। আইনে	৩		১			৪			৪	৪
৮। চিকিৎসায়	৪৫	৩৫	১৮			৬৩	৩৪		৯৮	৯৮
৯। বিবিধ বিষয়ে	১০১	৪৪৬	৪৯	১	৫	১৫০	৪৪৬	১২	৫৮৪	৯৯৬
১০। দর্শনে	৪					৪			৪	৪
১১। কাব্য ও কবিতায়	৪২		৬			৪৮		৫	৪৩	৪৮
১২। ধর্ম্মবিষয়ে	১৯২	৪৬	১৫	১০	২৮	২০৭	৪৬	৩	২৫০	১৫৩
১৩। বিজ্ঞানে	১৭		২৬			৪৩		৩৬	৭	৪৩
১৪। ভ্রমণে	১					১			১	১
১৫। রাজনীতিবিষয়ে	৬		১			৭			৭	৭
মোট	৬৪৩	৫৭৬	২৩১	২১	৪১	৮৭৪	৫৪৬	১৬৭	১২৪৩	১৪২০

খৃষ্টানদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্মপুস্তিকগুলি, এবারও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় তালিকা মধ্যে ধরা হয় নাই।

পূর্ব্বোক্ত বিভাগের মধ্যে—

ইতিহাস ও ভূগোলের	১৮ খানির মধ্যে	—	১৫ খানি
সাহিত্যের	৩৯ ,, ,,	—	৩০ ,,
কাব্য ও কবিতার	৪২ ,, ,,	—	৫ ,,
বিজ্ঞানবিষয়ক	১৭ ,, ,,	—	৭ ,,
বিবিধ বিষয়ক	৮২ ,, ,,	—	১২ ,,

মোট ৬৯ খানি পুস্তক স্কুলপাঠ্য

(ক) কলাবিদ্যা—এ বিভাগের ১৬ খানি পুস্তকের মধ্যে ৪ খানি পুস্তক উল্লেখযোগ্য।

১। ব্রহ্ম-সঙ্গীত স্বরলিপি—কাঙ্গালীচরণ সেন।

২। চিত্রবিদ্যা-শিক্ষা (১ম ভাগ) } ব্রজেন্দ্রকুমার গুহ

৩। চিত্রবিদ্যা-শিক্ষা (২য় ভাগ) }

৪। শিল্প রত্নাবলী (১ম খণ্ড)—মনোমোহন দাস ও অমূল্যরতন পাল।

কলাবিদ্যাবিভাগে এবারেও আমরা আশানুরূপ ফল পাই নাই। কোন একটা কলা, রীতিমত শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে তাহার বর্ণপরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া, উপর স্তর পর্য্যন্ত শিক্ষা দিবার জন্য ক্রমবিন্যস্ত পাঠ্যপুস্তক লিখিতে, কাহারও চেষ্টা দেখি না। ফটোগ্রাফি, চিত্রবিদ্যা, বর্ণবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে কতকগুলি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে; তাহার মধ্যে দুই এক খানি ভাল বই যে না আছে, তাহা নয়; কিন্তু রীতি-বিশুদ্ধ প্রণালীতে এ সকল বিষয়ে গ্রন্থ লিখিতে, কেহ আজিও প্রবৃত্ত হন নাই। সঙ্গীত-কলাসম্বন্ধে নানাবিধ বাজনার বোল্, নানারূপ রাগ-রাগিণীর গৎ, নানাবিধ ওস্তাদী আলাপ এবং বহুবিধ গান-সংগ্রহের বহু প্রকার পুস্তক বাহির হইয়াছে। কিন্তু সঙ্গীত-শাস্ত্রে পারদর্শী অধ্যাপকগণ, সঙ্গীত-বিজ্ঞানের সম্বন্ধে গ্রন্থ-লিখিতে প্রলুব্ধ হন না! এ সম্বন্ধে দুই এক খানা বই যে না আছে, এমনও নয়; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কেহ লাগিয়া পড়িয়া উঠেন নাই। এই কলিকাতা সহরেই ভারতসঙ্গীতসমাজ আছে, তাঁহাদের 'সঙ্গীত-প্রকাশিকা' আছে; অথচ আমাদিগকে বৎসর বৎসর এইরূপ আক্ষেপ করিতে হয়। "সঙ্গীত-প্রকাশিকায়" প্রতি মাসে নূতন পুরাতন গানের স্বরলিপি ভিন্ন আর কিছু থাকে না। সঙ্গীত-সমাজ, নাট্যকলার অনুরাগী; কিন্তু সঙ্গীত-প্রকাশিকায় ভারতের নাট্যশাস্ত্রের একটা ধারাবাহিক অনুবাদও যদি প্রকাশিত হইত, তাহা হইলেও, আমাদের একটা খেদ মিটিত।

"শিল্পরত্নাবলীতে" সাবান, তেল, গন্ধ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার প্রণালীগুলি, সাধারণ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। অন্যান্য শিল্প-সম্পর্কে এ-বারে ভাল বই প্রকাশিত না হইলেও,

বাঙ্গালা মাসিক পত্রগুলি শিল্পগ্রন্থের অভাব কতক পরিমাণে দূর করিয়াছে। এ গুলির আলোচনা করিলে, বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয়, ভারতের মৃত শিল্পের পুনঃ-সঞ্জীবন করিবার উদ্দেশ্যে বাঙ্গালীর প্রাণ কাঁদিয়াছে। বাঙ্গালী যথা-সময়ে সুযোগ ছাড়ে নাই। এ সময় শিল্পগ্রন্থের যাহাতে বহুল প্রচার হয় এবং সে সকল গ্রন্থ, যাহাতে সহজ-বোধ্য হয়, তদ্বিষয়ে সকলেরই চেষ্টাবান্ হওয়া উচিত। দুই খানি সঙ্গীত-গ্রন্থ বা পাঁচ খানি পাকপ্রণালী, প্রকাশিত হইলেই, কলাবিদ্যার আলোচনা হইতেছে বলিয়া সন্তুষ্ট থাকিলে, চলিবে না। শিল্পকলা-বিবরক য়ুরোপীয় গ্রন্থাদি, সরল বাঙ্গালায় সার-সঙ্কলন করিলেও, চলিতে পারে। যাহা হউক, গত বর্ষে এ বিষয়ে যে একটু আধটু চেষ্টা হইয়াছে—তাহাই যথেষ্ট।

(খ) জীবনী—এই বিভাগের ২৯ খানি পুস্তকের মধ্যে নিম্নলিখিত ১২ খানি পুস্তক উল্লেখ-যোগ্য। যথা—

১। দয়ানন্দের স্বরচিত জীবনবৃত্ত—শিশিরকুমার ঘোষাল।
২। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ—যোগেন্দ্রনাথ সরকার।
৩। সিদ্ধ-জীবনী—ব্রহ্মানন্দ ভারতী।
৪। কৃষ্ণচন্দ্রপাল—মথুরানাথ নাথ।
৫। আর্য্য-নারী (১ম ভাগ)—কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত ও দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার।
৬। বালগঙ্গাধর তিলক—নিতাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়।
৭। বুদ্ধদেব-চরিত—কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন।
৮। বিদ্যাসাগর—যোগীন্দ্রনাথ সরকার।
৯। হজরৎ মহম্মদের জীবনী (মাসলেম পত্রিকা)—ডাক্তার সৈয়দ আবুল হোসেন।
১০। সাহিত্য-সেবক—শিবরতন মিত্র।
১১। নবীনবাবু—
১২। রাজনারায়ণ বসু—

এতদ্ভিন্ন নানা মাসিক পত্রে আলোচ্য বর্ষে অনেকগুলি কর্ম্মবীর, ধর্ম্মবীর ও জ্ঞানবীরের জীবনী, প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা একটী সুলক্ষণ—সন্দেহ নাই। গত বৎসরে "বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবকে" শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়, স্বকীয় পরিশ্রমের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মথুরনাথ নাথ, বাঙ্গালাদেশের আদি খৃষ্টান কৃষ্ণচন্দ্র পালের জীবন-বৃত্তান্তে অনেক প্রয়োজনীয় কথার আভাস দিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে ভারতবর্ষের অসামান্য জ্ঞানী দয়ানন্দ সরস্বতীর জীবনী, বাঙ্গালায় প্রকাশ—আনন্দের বিষয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। বালগঙ্গাধর তিলকের জীবনীখানি, এরূপ ক্ষীণ-কলেবর না হইলেই, যেন ভাল হইত। যাহা হউক, দেখা যাইতেছে, আলোচ্য বর্ষে জীবনী-পুস্তকগুলি, মোটের উপর মন্দ হয় নাই। আমার মনে হয়, প্রতি বর্ষে অনেকগুলি করিয়া জীবনচরিত প্রকাশের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। পূর্ব্বে যেমন পুরাণপাঠ, কথকতা ইত্যাদির বহুল প্রচার ও আদর ছিল—তাহার উদ্দেশ্য ও

পরিণাম, জীবনীপাঠেরই তুল্য। আমাদের বর্ত্তমান সমাজে যাহাতে জীবনীগ্রন্থ, সেইরূপ হয়, তাহার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। আমরা মহতের আদর করিতে যতই শিখিব, আমাদের দেশে জীবনীগ্রন্থের সংখ্যা, ততই বৃদ্ধি পাইবে।

(গ) নাটকাদি—এই শ্রেণীর ৪৬ খানি পুস্তকের মধ্যে ২১ খানি উল্লেখ-যোগ্য ;—

১। অশোক—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।
২। বরুণা—　　,,
৩। বাসন্তী—　　,,
৪। শারদোৎসব—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৫। হিন্দাহাফেজ—অতুলকৃষ্ণ মিত্র।
৬। দেলেরা—ননীলাল সুর।
৭। মাতৃপূজা বা স্বর্গোদ্ধার—কুঞ্জবিহারী গাঙ্গুলি।
৮। উষা—মহেন্দ্রনাথ তালুকদার।
৯। স্বপ্ন-মিলন গীতি-নাট্য—কামাখ্যাপ্রসাদ সেন।
১০। দলিতা-ফণিনী—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।
১১। প্রহসন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
১২। প্রতাপসিংহ—শশিভূষণ মজুমদার।
১৩। অদৃষ্ট—হরিচরণ সেনগুপ্ত।
১৪। শ্রীমতীর বন্দে মাতরম্ বা মহিলা-মিলন—শ্যামাপদ নাগ।
১৫। মেবার-পতন—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।
১৬। শাস্তি-কি-শাস্তি—গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
১৭। সোরাব-রুস্তাম—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।
১৮। বীর-পূজা—হরনাথ বসু।
১৯। কংস-বধ—অহিভূষণ ভট্টাচার্য্য।
২০। রণজিতের জীবন-যজ্ঞ
২১। জয়দ্রথ-বধ গীতাভিনয়—কালীকিঙ্কর সেন।

গত ও গত পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় এ বৎসরও নাটক-শ্রেণীতে কয়েক খানি,উত্তম পুস্তক বাহির হইয়াছে। তাহার মধ্যে ঐতিহাসিক নাটকগুলিই, প্রধান ও সংখ্যায় অধিক। দেখা যাইতেছে, নাট্যকারেরা গত দুই বৎসর বাঙ্গালার প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস লইয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছেন। ইহার কারণ যাহাই হউক, ফলে আমরা কয়েকখানি পাঠোপ-যোগী নাটক পাইয়াছি। গীত-নাট্যে কল্পনাপ্রসূত কয়েকখানি নাটকও প্রকাশিত হইয়াছে। গত বৎসর সামাজিক নাটক ৫ খানি বই প্রকাশিত হয় নাই। ঐতিহাসিক নাটক যাঁহারা লেখেন, তাঁহাদের অনেকে ইতিহাসের সম্মানটা মলাটে মাত্র বজায় রাখেন। কেহ এক-

খানি মাত্র ইতিহাস, কেহ পাঁচখানা ইতিহাসের পাঁচ জায়গা দেখিয়া, ঐতিহাসিক নাটক লিখিয়া থাকেন। ফলে, ঐ সকল নাটকে ইতিহাসের "মুড়া মুড়ো" খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই সকল ঐতিহাসিক নাট্য কবি, পিতার বিবরণ পুত্রের ঘাড়ে, বধূর ব্যাপার শাশুড়ীর স্কন্ধে, রাজার মুখে রাধার ভাষা, বাদশাহের সভায় "গেঁয়ো" সভ্য-পদ চাপাইয়া দিতে, ত্রুটি করেন না। কবিরা নিরঙ্কুশ আমরা মানি, কিন্তু সাহিত্যের গভীর ভিতরে ইতিহাস, ছন্দঃ, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, অভিধান মানিয়া না চলিলে, তাঁহারা কবিত্বের দাবী করিবেন কিসে? ভগবানের সৃষ্ট হাতী ঘোড়া ক্ষেপিলে, গুলি করিয়া মারিবার একটা প্রথা আছে। সাহিত্যের আদালতে এই সকল মদ-মত্ত নিরঙ্কুশ কবিরা, কিরূপ দণ্ড পছন্দ করেন, জানিতে পারিলে, আমরা সুখী হইব। যাত্রায় অভিনীত পুস্তকগুলির মধ্যে পুষ্কর বিজয় বা সহস্র-স্কন্ধ রাবণ-বধ, "বিজয়বসন্ত গীতাভিনয়" প্রভৃতি কয়েক খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রহসন, এবার অনেকগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'তুফানি', সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের "যৎকিঞ্চিৎ" এবং বিহারিলাল দত্তের 'মজা কি সাজা'-ই উল্লেখযোগ্য। 'তুফানি' Molere এর L' Efroldı অবলম্বনে লিখিত। "যৎকিঞ্চিৎ" বালিকাদিগের উচ্চ শিক্ষার চূড়ান্ত নমুনা।

(ঘ) উপন্যাস—এই বিভাগের ৮৪ খানি পুস্তকের মধ্যে ১৬ খানি উল্লেখযোগ্য ;—

১। হেমেন্দ্রলাল—ভবানীচরণ ঘোষ।
২। জড়-ভরত—দীনেশচন্দ্র সেন।
৩। রক্ত-হাস—দুর্গাদাস লাহিড়ী।
৪। লক্ষ টাকা উপন্যাস } পাঁচকড়ি দে।
৫। সুহাসিনী ও ঠিকে ভুল }
৬। নীরদা – সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৭। ভৈরবী } সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।
৮। স্বপ্নসুন্দরী }
৯। সরলা—উষা প্রমোদিনী।
১০। ভবের খেলা—ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
১১। অভিশাপ—হরিহর শেঠ।
১২। নাগ-পাশ—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।
১৩। অমরাবতী, মুরলা—নবকুমার দত্ত।
১৪। সাবিত্রী—S. P. Sen,
১৬। ইতিকথা—নিখিলনাথ রায়।

(গ) গত বৎসরের ন্যায় এবারেও ভাল উপন্যাসের সংখ্যা বড় অল্প। এবার ছোট গল্পের সংগ্রহ-গ্রন্থ ও ডিটেক্‌টিভ গল্প, বেশী প্রকাশিত হইয়াছে। ভবানীবাবুর "হেমেন্দ্রলাল"

এবার উপন্যাস-বিভাগের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। হেমেন্দ্রবাবুর "নাগপাশ" অনেক পাঠকেরই সুবিজ্ঞাত। এই উপন্যাস-বিভাগেও আমাদের সেই পূর্ব্ব আক্ষেপ বিদ্যমান রহিয়াছে। তবে একটা কথা। এক বৎসর এইরূপ সাহিত্য-বিবরণে বলিয়াছিলাম যে, ছোট গল্পের প্রভাবে বাঙ্গালায় আর ভাল উপন্যাস বড় জন্মিতেছে না। ছোট গল্পগুলি যদি ভাল হয়, সে অভাবের জন্য আমরা দুঃখ করি না। আমাদের সে কথা, এবৎসর ফলিয়াছে। এ বৎসর কতকগুলি ভাল ছোট গল্পের সংগ্রহ-পুস্তক ছাপা হইয়াছে;—নিখিল বাবুর 'ইতিকথা'-নামক গ্রন্থ এই শ্রেণীতে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মাসিক পত্রেও অনেক-গুলি ছোট গল্প বাহির হইয়াছে। আমরা একবার আক্ষেপ করিয়াছিলাম—বাঙ্গালায় উপন্যাস, সংখ্যায় অনেক হয়, কিন্তু গল্পে নূতন হয় না। যদি বাঙ্গালী নূতন গল্প লিখিতে না পারেন, তবে উপন্যাস লেখা বন্ধ করুন। আমাদের সে নিবেদন এবার সফল হইয়াছে। এ বৎসর আমাদের ফর্দ্দে এতগুলি উপন্যাসের নাম থাকিলেও ডিটেক্‌টিভের গল্প এবং ছোট গল্পগুলি বাদ দিলে, উপন্যাসের সংখ্যা ভীতিজনক হইবে না। ইহাতেই বুঝিতেছি, বাঙ্গালী আর প্রেমিক-প্রেমিকার প্রণয়-লীলার মধ্যে বিপদ্, বিচ্ছেদ মরণ ঘটাইয়া এমনই ভাবের শত সহস্র গল্প লিখিয়া, পরিশ্রম নষ্ট করিতে প্রস্তুত নন। এখন বাঙ্গালার উপন্যাস-লেখকেরা, সংযত হইয়া, বাঙ্গালী-জীবনে উপন্যাসের উপযুক্ত কি উপাদান আছে, তাহাই খুঁজিতেছেন, আর সেই জন্যই বোধ হয়, ছোট গল্পের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে।

ইতিহাস-ভূগোল-গ্রন্থ—এই শ্রেণীর ১৮ খানি পুস্তকের মধ্যে ২ খানি উল্লেখযোগ্য;—

১। বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস (১ম খণ্ড)—দুর্গাচরণ সান্যাল।

২। নবীন জাপান—রসিকলাল গুপ্ত।

এ বৎসর "বঙ্গের পুরাবৃত্ত" বা "আলিয়াৎ ক্লাইবের" ন্যায় গ্রন্থ বাহির হয় নাই। 'বাঙ্গালীর সামাজিক ইতিহাস' ও 'নবীন জাপান' এ বিভাগের মুখ রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু এক দিক্ দিয়া দেখিলে, বলিতে হইবে যে, এ বৎসরের মত পূর্ব্বে কখনও এত অধিক ঐতিহাসিক চর্চ্চা হয় নাই। মাসিক পত্রগুলি, ঐতিহাসিক আলোচনা-পূর্ণ। সুখের বিষয়—এবার অন্য দিক্ দিয়া, ইতিহাসের আলোচনা হইয়াছে।

(চ)—এই শ্রেণীর ৪৫ খানি গ্রন্থের মধ্যে ৬ খানির নাম উল্লেখযোগ্য—

১। স্বাস্থ্য-চিকিৎসা—শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

২। পশু-চিকিৎসা—তারাপদ শর্ম্মা।

৩। পশু-চিকিৎসা—কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন।

৪। ভৈষজ্য-লক্ষণ-সংগ্রহ (১ম খণ্ড)—মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কোম্পানি।

৫। " (২য় খণ্ড) "

৬। সংক্ষিপ্ত গার্হস্থ্য-চিকিৎসা—গণনাথ সেন বিদ্যানিধি কবিভূষণ।

এই শ্রেণীতে তৃপ্তি দিতে পারে, এমন কোন পুস্তক, এ বৎসর প্রকাশিত হয় নাই। এই

বিভাগে গ্রন্থসংখ্যা পুষ্টির জন্ত আমরা যুরোপীয় ভাষায় লিখিত বিবিধ চিকিৎসাবিজ্ঞানের গ্রন্থের আলোচনামূলক গ্রন্থ অথবা কেবল ভাষান্তরিত গ্রন্থের আশা করিয়া থাকি। এ সহরে গলিতে গলিতে ডাক্তার কবিরাজ বর্ত্তমান। অনেকে গ্রন্থও লিখিয়া থাকেন; কিন্তু কেহই আমাদের আশা পূর্ণ করিতে অগ্রসর হন না, ইহা বড়ই ক্ষোভের কথা। মাসিকপত্রের প্রবন্ধের উল্লেখ-স্থানে আমরা দেখাইব—একটীমাত্র কবিরাজ, যুরোপীয় শারীরশাস্ত্রের ঐক্য অনৈক্য দেখাইয়া, প্রবন্ধাদি লিখিতে প্রস্তুত হইয়া আছেন। এইরূপ অন্যান্য বিষয় লইয়া অন্যান্য ভিষক্, যদি লিখিতে আরম্ভ করেন, আমাদের কতক ক্ষোভ মেটে। হোমিওপ্যাথী, এলোপ্যাথী, কবিরাজী, হাকিমী, এ দেশের এই চারিবিধ চিকিৎসা ব্যবস্থার মধ্যে একটা প্রধান বিষয় আমাদের লক্ষ্যীভূত হইয়াছে। হোমিওপ্যাথী মতে দুইটা বিভিন্ন ঔষধের সংযোগে ঔষধের গুণ-ব্যত্যয় বা শক্তিবৃদ্ধির কথা স্বীকৃত হয় না। অপর তিন প্রথায় তদ্ব্যতীত চিকিৎসা করা চলে না। কবিরাজী এবং হাকিমী—যে দুটী ঐ দেশের অস্থি-মজ্জাগত, তাহাতে আবার অনুপান-সংযোগে ঔষধ-সেবনের ব্যবস্থা, আরও ফলদায়িনী বলিয়া বিবেচিত হয়। এই দুই বিভিন্নমতের সামঞ্জস্য, অবশ্যই আছে। নতুবা উভয়প্রথাতেই রোগ প্রশমিত হয় কেন? সে সামঞ্জস্য কোথায়—তাহা প্রচারিত করিতে, বিভিন্নমতের চিকিৎসকেরা চেষ্টা করেন না কেন, তাহা বুঝিতে পারি না। ইহা প্রকাশিত হইলে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিভিন্ন পন্থার তর্ক মিটিয়া যায়। তাহাতে ঔষধ-প্রয়োগের মূল সূত্র প্রকাশ হইয়া পড়ে।

বিবিধ ধর্ম্মসঙ্গীত—প্রসন্নকুমার সেন।

নূতন মাসিক—

১। ছাত্রসখা—মন্মথমোহন বসু।
২। বাল্যসখা—
৩। প্রকৃতি—
৪। সুপ্রভাত—কুমুদিনী মিত্র।
৫। শিবপুর কালেজপত্রিকা—তুলসীদাস কর এম্, এ,
৬। তারা—
৭। পল্লীচিত্র—
৮। কমলা (পুনঃপ্রকাশিত)—
৯। বঙ্গভাস্কর—
১০। পথিক—
১১। চিন্তা—
১২। গৃহলক্ষ্মী—শান্তিময়ী সেন।

দৈনিক—সোণার বাঙ্গলা। সাপ্তাহিক—নায়ক।

(ছ) দর্শন—এই বিভাগের ৪ খানি পুস্তকই উল্লেখযোগ্য।

১। উপনিষদের উপদেশ (কঠ ও মন্ডুক) ২য় খণ্ড—কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন।

২। তারামণির অন্বেষণ—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩। প্রেততত্ত্ব—সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

৪। পরলোকতত্ত্ব—কালীবর বেদান্তবাগীশ।

এ বিভাগে এবার ৪ খানি অতি সুন্দর পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। দুই বৎসর পূর্ব্বে হীরেন্দ্রবাবুর "গীতায় ঈশ্বরবাদ" বাঙ্গালীর মুখ যেরূপ উজ্জ্বল করিয়াছিল, তাহার প্রভা এখনও মলিন হয় নাই। ইতোমধ্যেই আমরা চারিখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাইয়াছি। সংখ্যায় কম হইলেও, এই গ্রন্থচতুষ্টয় অনেক দার্শনিক তত্ত্বের পরিচয় দিয়াছে।

(ঞ) সাহিত্য—এই শ্রেণীর ৩২ খানির মধ্যে নিম্নলিখিত দুই খানি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

১। কাব্যকথা—সুরেশচন্দ্র সেন, এম্ এ।

২। কালিদাস—রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

এ শ্রেণীর সমস্তই প্রায় স্কুলপাঠ্য। অবশিষ্ট যে কয়খানি, সাহিত্য-নামধারী—তাহার মধ্যে উল্লিখিত কয়খানি ভিন্ন কোন খানিই উল্লেখযোগ্য নয়। এই বই কয়খানি সাহিত্যের আদর, গৌরব ও সম্মান রক্ষা করিয়াছে। ব্যোমকেশ বাবু ১৩১০ সালের সাহিত্যের বিবরণে বলিয়াছেন, "যে দেশের লেখক পাঠক সকলেই—মহাবিজ্ঞ সমালোচক, সে দেশে যে, প্রকৃত প্রস্তাবে একখানিও সমালোচনা-গ্রন্থ প্রকাশিত হয় না, ইহা বিস্ময়ের কথা বটে! পূর্ণবাবুর 'কাব্যসুন্দরী', গিরিজাবাবুর তিন খণ্ড "বঙ্কিমচন্দ্র", বীরেশ্বর বাবুর "উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত," যোগীন্দ্র তর্কচূড়ামণির "মেঘনাদবধ প্রবন্ধ" ব্যতীত নাম করিবার মত সমালোচনার গ্রন্থ আর নাই বলিলেই চলে। গিরীশবাবু, রাজকৃষ্ণবাবু প্রভৃতির নাটক-কাব্য, রবীন্দ্রনাথ, ৺হেমচন্দ্র প্রভৃতির কাব্য ও কবিতা, দামোদর বাবু, রমেশবাবু প্রভৃতির উপন্যাসাবলীর সমালোচনা-গ্রন্থ কেন যে প্রকাশিত হয় না, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। এই সমস্ত মনীষী লেখকের রচনার সমালোচনা হইলে, সাহিত্যের পুষ্টি ব্যতীত মার্জ্জনাও হইতে পারে। ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের "সাহিত্য-মঙ্গল" মত প্রবন্ধপুস্তকও আর প্রকাশিত হইতেছে না। ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয়, আর কি হইতে পারে?"

(ঝ) আইন—এই শ্রেণীর ৩ খানি গ্রন্থের মধ্যে ১ খানি গ্রন্থ উল্লেখ্য।

১। প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়ত গাইড—জ্ঞানদানন্দ চক্রবর্ত্তী।

(ঞ) ধর্ম্ম—এই বিভাগের ১৯০ খানি পুস্তকের মধ্যে নিম্নলিখিত ৩ খানি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য—

১। ঈশ্বরভক্তি—অমরনাথ সিংহ বি, এল,

২। নিবেদন—নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র এম্, এ,

৩। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—(৩য় ভাগ) মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

বড়ই ক্ষোভের বিষয়, দিন দিন ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে। যে দুই এক